সূর্যমুখী

শিবনাথ ভাদুড়ী

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৭১
প্রচ্ছদ : শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ

শ্রীদ্বিজদাস কর কর্তৃক তণিমা প্রকাশনী ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-
৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীঅজিত পাল কর্তৃক দুর্গা প্রিন্টার্স
১০/১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

দাদা ও বৌদিকে—

বৈশাখের দুপুর। বেলা খুব বেশি হয়নি। কিন্তু সূর্যের তেজবৃদ্ধি দেখে মনে হয়না সে কথা। আগুনের হলকা ফোস্কার মত জ্বালা ছড়াচ্ছে সারা শরীরে। ঘরের থেকে বাইরের দিকে তাকালেও চোখ ঝলসে যাচ্ছে। অগ্নিকাণ্ড চলেছে যেন প্রকৃতিতে। দুর্গাপুরের থেকে গরমের কিছু কমতি দেখছেনা মৃদুলা কলকাতায়। বরং দুর্গাপুরে ঘাম হয়না এরকম। ঘরের মধ্যে বসেও রেহাই নেই। পাখা চলছে পূর্ণগতিতে। তবু ঘামের বিরাম নেই।

দুর্গাপুরের স্কুল লাইব্রেরি থেকে আনা মিসেস কে-র পার্পল ভ্যালি নিয়ে বসে আছে মৃদুলা অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু অসহ্য গরমে ছটফট করতে করতে মনঃসংযোগ করতে পারছেনা সে। এর মধ্যেই ঘামাচি হয়ে গেছে তার। অন্যান্য বার ঘামাচি হয়না। এবার গরম বেশি পড়েছে না তার শরীরে গরম সহ্য করার ক্ষমতা কমে গেছে জানেনা সে। কিন্তু ঘামাচির চিড়বিড়ে জ্বালা সহ্য হচ্ছিলনা।

খুব সকালে স্নানের অভ্যাস মৃদুলার। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্নানান্তে প্রাতরাশের পালা শেষ করে মৌজ করে বসেছিল সে প্রিয় লেখিকার বইটি নিয়ে। বাড়িতে তারা দুটি মাত্র প্রাণী। ঠিকে লোকটি সকাল সন্ধ্যা নিয়ম করে এসে কাজ সেরে দিয়ে যায়। স্বামী বেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। দুপুরের খাওয়া সারে সে অফিসেই। তবে প্রাতরাশের আয়োজন তার ভাল চাই। দুপুরে বেশির ভাগ দিনই রান্না করেনা মৃদুলা। সকালে ভারী প্রাতরাশ সেরে দুপুরে খাওয়ার তাগিদ বড় একটা বোধ করেনা বলে। কফি, দুটি বিস্কুট বা ফলের রস খেয়েই হয়ে যায় তার। বরাবর মিতাহারী সে। ইদানীং শরীরে চর্বি দেখা দেওয়ায় আরও বেশি করে সতর্ক হতে হয়েছে তাকে। একমাত্র রাত্রি বেলায় ভাত খায় সে। তার সঙ্গে মাছ বা মাংস কিংবা কিছু সবজি আর দুধ। শুধু এখানে নয়, দুর্গাপুরেও একই নিয়মে চলে সে। বরং সেখানে প্রাতরাশের পর্বটি অনেক হালকা থাকে।

অফুরন্ত অবসর তার সারা দুপুর। ঘর গৃহস্থালীর কাজে কোনদিনই তেমন মন নেই। এখানে আসে সে ছুটিছাটায়। যা কিছু করার তা করে তার স্বামী। খুবই গোছালো স্বভাবের সে। দিব্যি সাজানো

গোছানো সংসার এখানে। অফিসের কাজে খুবই ব্যস্ত থাকে দীপঙ্কর। তবু তারই মধ্যে সময় করে গুছিয়ে টুছিয়ে রাখে তার দুই কামরার ফ্ল্যাটটিকে। তুলনায় অনেক অগোছালো তার দুর্গাপুরের ফ্ল্যাটটি।

দুর্গাপুরেও বেশির ভাগ সময়টা কাটিয়ে দেয় সে বই পড়ে। গ্রন্থাগারিক হিসাবে ভাল ভাল বই পড়ার এই সুযোগটি মৃদুলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে থাকে। এবারও আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বেশ কয়েকটি ভাল বই। কিন্তু কলকাতার গরম এবার যেন অসহ্য ঠেকছে। গত কয়েক দিন ধরে রাতে পর্যন্ত ভাল করে ঘুম হচ্ছেনা তার। দিনের বেলায়ও অস্বস্তি। খেতে ভাল লাগেনা, পড়তে ভাল লাগেনা। বিশ্রামের অবসরও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে রীতিমত।

গরমের প্রকোপ আর কয়েক দিন চললে পড়াশোনা শিকেয় উঠবে। কিন্তু শুধু শুধু অতগুলি বই নিয়ে এসে সেগুলি না পড়েই আবার দুর্গাপুরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হয়না। তাছাড়া শীত গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষার প্রকোপ তো গতানুগতিক নিয়মের বাইরে নয়? এতটা কাহিল হয়ে পড়ছে কেন সে? নিজেকে মনে মনে তীব্র ভাষায় শাসন করে আবার সেই পূর্বপঠিত অংশ থেকেই পুনোদ্যমে পড়তে সুরু করে দেয় মৃদুলা। এবার তার মনঃসংযোগ ছিন্ন হোল কলিংবেলের মিষ্টি টুং টাং আওয়াজে। এমন সময় কে আসতে পারে তার কাছে ভাবতে ভাবতে খাট থেকে নেমে দরজার পিপ-হোলে উঁকি মেরেই দারুণ অবাক হয়ে যায় সে। সুস্মিতাদিকে একেবারেই আশা করেনি এ সময়। ইদানীং কলকাতায় সুস্মিতাদি তার ব্যক্তিগত কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে তার মধ্যে সময় করে নিয়ে তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবেন তা যেন ভাবাই যায়না।

দরজা খুলে সুস্মিতাদির দিকে তাকিয়েই মৃদুলা বুঝতে পারে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে। শরীরে মনে ভয়ঙ্কর রকম বিপর্যস্ত না হলে ওরকম দেখায়না কোন মানুষকে। কোন রকমে শাড়ি ব্লাউজ গায়ে জড়িয়ে চলে এসেছেন এখানে। মুখচোখের ভঙ্গী খুব স্বাভাবিক লাগছেনা। ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত আর রিক্ত এক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে। মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল তা মুখে ব্যক্ত না করে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মৃদুলা সুস্মিতাদির দিকে।

ঘরে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়লেন সুস্মিতাদি একটা সোফায়।

দরদর করে ঘাম ঝরছিল কপাল গাল বেয়ে। আধময়লা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে চোখ বুঁজে একভাবে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। দরজা বন্ধ করে আস্তে আস্তে শঙ্কিত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে সুস্মিতাদির পাশে একটা সোফায় বসে পড়ল মৃদুলা। নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল কখন উনি স্বাভাবিক হয়ে নিজের থেকেই কথা বলবেন তার সঙ্গে।

একটু পরে বেদনার্ত দুটি চোখ মৃদুলার দিকে তুলে ধরে আস্তে করে উচ্চারণ করলেন তিনি কয়েকটি কথা।

—মৃদুলা, পিনাকী নেই।

এত অপ্রত্যাশিত ছিল সেই সংবাদ যে এক মুহূর্ত মৃদুলা অনুধাবন করার চেষ্টা করল প্রকৃতপক্ষে কি অর্থ হতে পারে ঐ কথাগুলির। পিনাকীদার অস্তিত্ব সুস্মিতাদির জীবনে নানা অর্থে এত বেশি সোচ্চার, এত বেশি তরঙ্গসংকুল যে সেই ব্যক্তি এত তাড়াতাড়ি এভাবে নিঃশব্দে হঠাৎ সব আলোচনা, সব সমস্যার অন্তরালে চলে যাবেন তা যেন ভাবা যায়না।

পিনাকীদার সঙ্গে সুস্মিতাদির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বেশ কয়েক বছর। তার অনেক আগেই একটু একটু করে তার জীবন থেকে মুছে গেছেন সুস্মিতাদি। সুস্মিতাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে তার মনের অনেক জটিল অলিগলির খবর জেনে ফেলেছে মৃদুলা। প্রায় পনর বছর ধরে দেখছে সে তাকে। অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী হৃদয়াবেগের সমাবেশ রয়েছে এই মানুষটির চরিত্রে। এত বৈপরীত্য যে একজন মানুষের স্বভাবে থাকতে পারে তা সুস্মিতাদিকে না দেখলে জানতে পারতনা সে কোন দিন।

প্রথম প্রথম ভারী বিস্ময় বোধ হোত। সে ভাবত এমন সহজ সরল মানুষটাই আবার ক্ষেত্রবিশেষে এত জটিল দুর্বোধ্য হয়ে যায় কি করে? ভালবাসা মায়া মমতার বন্যায় যে মানুষটা ভাসিয়ে দিচ্ছে অনেকের হৃদয়মন সেই মানুষই আবার ঘৃণা বিদ্বেষ ক্রোধ অসূয়ার প্রবল হৃদয়াবেগে তাড়িত হয়ে কি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করছে অন্যদের কাছে! যার মধ্যে পরার্থপরতা, মহত্ব আর উদারতার চরম প্রকাশ দেখে তারা কতদিন বিস্ময়-বিমূঢ় বোধ করেছে, তাকেই আবার যখন বিশেষ কোন পরিস্থিতির মোকা-বেলায় অত্যন্ত ঘৃণ্য, নীচ আর নির্মম আচরণ করতে দেখেছে, তখন এ কথা না ভেবে পারেনি যে পৃথিবীর আশ্চর্যতম জিনিষ হচ্ছে মানুষের

মন। এর অতল রহস্যের কূলকিনারা পাওয়া খুব দক্ষ আর অভিজ্ঞ ডুবুরীর পক্ষেও বুঝি সম্ভব নয়।

পিনাকীদার সঙ্গে সুস্মিতাদির সম্পর্ক সেই জটিল মানসিক টানা-পোড়েনের সূত্রে বাঁধা ছিল। মৃদুলারা তার সাক্ষী। সব শিক্ষিকার সঙ্গে সুস্মিতাদির সম্পর্ক খুব সহজ স্বাভাবিক আর অন্তরঙ্গ ছিলনা। বাংলার শিক্ষিকা সুস্মিতাদির সম্পর্কে অনেকেরই মনে যথেষ্ট বিরূপতা ছিল। অধিকাংশই তাকে অপছন্দ করত। তা অবশ্য অকারণে নয়। সুশিক্ষিতা রুচিশীলা সংস্কৃতিসম্পন্ন এই শিক্ষিকাটির পড়াবার ক্ষমতা অসাধারণ থাকলে কি হবে? বড়ই ফাঁকিবাজ ছিলেন তিনি। প্রায়ই ক্লাস নিতেননা। অনেক সময় আবার খুব দেরি করে ক্লাসে আসতেন। তবে ক্লাস নিলে আর দেখতে হোতনা। দুর্বোধ্য জটিল বিষয়কেও মনোরম, হৃদয়গ্রাহী আর সহজবোধ্য করে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। ছাত্রীদের কাছে সেরকম কথাই শুনেছে সে একাধিকবার। নিজেও লক্ষ্য করে দেখেছে মেয়েরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে তার পড়ানো। তাদের মুগ্ধতা প্রচ্ছন্ন থাকেনা তাদের মুখভাবে।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর মত উৎসব অনুষ্ঠানে মৃদুলা দেখেছে কি মনোরম ভঙ্গীতেই না উনি নিজের বক্তব্য বলার ক্ষমতা রাখেন! বাচনভঙ্গী কিংবা কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্যই তার একমাত্র কারণ ছিলনা। আসলে মৌলিকতা ছিল সুস্মিতাদির মধ্যে। যা বলতেন, যা লিখতেন তা গতানুগতিক হতো না। মৃদুলা শুনেছে খুবই ভাল ছাত্রী ছিলেন সুস্মিতাদি। মেধা কিংবা প্রতিভা কোনটারই অভাব ছিলনা। অতি বাল্যবয়সে প্রেমরোগে কাবু না হলে মানুষটা নিজের ক্ষমতায় অনলস প্রচেষ্টার জোরে অনেক কিছুই করতে পারতেন। অধ্যাপনা কিংবা সাহিত্যে নিজের বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখতে পারতেন। শুধু কি তাই? আবৃত্তি কিংবা সঙ্গীতে পর্যন্ত তার পারদর্শিতা ছিল ঈর্ষা করার মত। দুর্গাপুরের ষ্টিল প্ল্যান্টের এই স্কুলেও তার বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। তবু বহুদিন মৃদুলার মনে হয়েছে সুস্মিতাদির মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে তার বড় অপচয় হয়েছে। একটা মানুষের মধ্যে বহুমুখী সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গ্রহ নক্ষত্রের কোন অশুভ সমাবেশে তার সম্যক স্ফূরণ ঘটলনা ভেবে তার মন বারবার বিষণ্ণ হয়েছে।

মৃদুলার সঙ্গে একমত হতেন অনসূয়াদিও। অনসূয়া ঘোষ দস্তিদার।

সুস্মিতাদির মত উনিও বাংলার শিক্ষিকা। এক হিসাবে ওর সঙ্গে সুস্মিতাদির বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার কথা নয়। দুজন ব্যক্তি একই বিষয় পড়ালে এবং পড়ানোর ব্যাপারে একজনের নামডাক বেশি থাকলে স্বাভাবিক কারণেই অপরের মনে হিংসার উদ্রেক হতে পারে। কিন্তু প্রায় সমবয়সী এই দুজন শিক্ষিকার মধ্যে সব কিছু সত্ত্বেও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক ছিল। মৃদুলার ধারণা সে ব্যাপারে সুস্মিতাদির তুলনায় অনসূয়াদির ভূমিকা অনেক বেশি। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেই এরা দুজনে এসেছিলেন এই স্কুলে। সুস্মিতাদির স্বভাবে এই দীর্ঘ সময়ে অনেক পরিবর্তনের জলহাওয়া লেগেছে। ঘটনাচক্রে মানুষটা অনেক অন্যরকম হয়ে গেছে। অনসূয়াদির কাছেই একথা শুনেছে মৃদুলারা।

অল্প বয়সে সুস্মিতাদির মধ্যে নাকি এখনকার অনেক দোষত্রুটি ছিলনা। সেজন্যই বন্ধুত্ব তৈরি হতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে একাধিক ছিদ্রপথে বিরোধের সর্পজিহ্বা দংশনের জন্য লকলক করে উঠেছিল। কিন্তু অনসূয়াদি সতর্ক থেকে তার সম্ভাবনা দূর করে দিয়েছেন।

প্রতিভা বা মেধায় অনসূয়াদি সুস্মিতাদির চেয়ে নিঃসন্দেহে খাটো। কিন্তু স্বভাবমাধুর্যে অনসূয়াদি এককথায় তুলনাহীনা। স্কুলে কারুর সঙ্গেই অসদ্ভাব নেই তার। তবে তারই মধ্যে সুস্মিতাদির প্রতি একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায় তার আচরণে। মৃদুলারা দেখে অবাক হয়েছে সুস্মিতাদির কত দৌরাত্ম্য সহ্য করে যান তিনি নির্বিবাদে। অনসূয়াদির স্বামী হিমাদ্রিশেখর কিন্তু আদৌ প্রসন্ন নন সুস্মিতাদির ওপরে। নানা উপলক্ষে মৃদুলাদের অজানা থাকেনি সেটা।

কোন এক সময়ে সুস্মিতাদি নিজের মনের জ্বালা উপশমের জন্য সকাল সন্ধ্যা এমনভাবে অনসূয়াদির বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাকতেন যে অনসূয়াদির হোত মুশকিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে অনসূয়াদি তার অসহায়তা ব্যক্ত করেছিলেন তার কাছে। মৃদুলার সঙ্গে সুস্মিতাদির একটা অনাবিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে সুস্মিতাদির কথা মৃদুলাকেই বলতেন বেশি। অপরের কাছে সে প্রসঙ্গ উত্থাপনে বিপত্তি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করতেন তিনি। তবে মৃদুলার কাছেও নিজের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করতে কম কুণ্ঠা বোধ করেননি।

—মুশকিল কি জানিস, মৃদুলা, আমি সুস্মিতাকে যত ভাল করে জানি ও তো তত ভাল করে জানেনা? ও শুধু ওর অস্বাভাবিকতাই দেখছে। রাগ করছে তা নিয়ে। ওর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই বলে আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বলে, 'আমাদের তো একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে? ভদ্রমহিলার নয় নিজের সংসারের বালাই নেই। তাই বলে আমাদের সংসারে সকাল সন্ধ্যা এরকম মূর্তিমতী উৎপাত হয়ে বিরাজ করবে? আমি আর বেশি দিন বরদাস্ত করবনা এ জিনিস।' কিন্তু তুই বল আমি কখনও অমন নিষ্ঠুর হতে পারি? কবে থেকে পরিচয় আমাদের। ওর কষ্টটা তো বুঝি আমি! বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে যার খাঁ খাঁ করে সে কি করে অন্যকে শান্তি দেবে? অন্যের শান্তিই বা সহ্য করবে কি করে? এ যে আমার কি জ্বালা হয়েছে! ঘর সামলাই না পর সামলাই? ওর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হচ্ছে আমার সুস্মিতাকে নিয়ে। কিন্তু তুই-ই বল ওকে আমার অসুবিধার কথা বলি কি করে?

সুস্মিতাদিকে দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অতীতের এসব স্মৃতি ভিড় করে এল তার মনে। মনে পড়ল আরও অনেক কথা। সুস্মিতাদির সুখী দাম্পত্য জীবনের টুকরো টাকরা ছবি, তার দাম্পত্য অশান্তির মর্মছেঁড়া কত ঘটনা। সুস্মিতাদির কান্না, অভিমান, ক্রোধ, হতাশার কত স্মৃতি বন্যার তোড়ের মত ধেয়ে আসতে চাইছিল কেবলি।

তার বারবার মনে হচ্ছিল একটি কথা। গঙ্গায় এত জল বয়ে গিয়েছে এত দিনে, তবু সুস্মিতাদি পিনাকীদার আকর্ষণে বারবার ছুটে আসতেন কলকাতায়। প্রায়ই ছুটি নিয়ে পড়ে থাকতেন কলকাতায়। ইদানীং ছুটি পাওনা না থাকায় মাইনে পর্যন্ত কাটা যাচ্ছিল। তবু কি যে উন্মাদ আকর্ষণের চুম্বকে বাঁধা ছিল তার মন! পিনাকীদা তো কবেই তাকে নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকার করেছেন। তবু তাকে দেখার জন্য, তার উপর খবরদারী করার জন্য সে কি চেষ্টা সুস্মিতাদির! বাড়াবাড়িও কম করেননি। শেষে পিনাকীদা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। দুর্গাপুরে ফিরে নিজের মুখেই আবার কবুল করেছেন সেসব।

—আমি সব লক্ষ্য রাখছি বুঝলি তো? ওকে আমি ছাড়ব কেন? আমার সঙ্গে যে এত বড় প্রতারণা করল সে শাস্তি পাবেনা? ওকে আমি শান্তিতে থাকতে দেবনা।

কিন্তু এই মুহূর্তে সুস্মিতাদিকে দেখে তার মনে হচ্ছে চোখের

সামনে একজন বিধবস্ত, দুঃখী, সর্বহারা মানুষকে দেখছে সে। কোন মানুষ তার দামী মূল্যবান সম্পদ খুইয়ে ফেললে তার মুখে চোখে যে রিক্ততা ফুটে ওঠে সেরকম রিক্ততা আর বিহ্বলতা দেখা যাচ্ছে তার মুখে-চোখে। প্রতিশোধস্পৃহায় যে মানুষটা একদিন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনের মত আচরণ করেছে তার এমন সর্বহারা রূপ যেন অকল্পনীয়।

কি বলবে ভেবে পাচ্ছিলনা মৃদুলা। মনের মধ্যে তার হাজার প্রশ্ন উত্তাল হয়ে উঠছিল। কিন্তু কিভাবে সেগুলি ব্যক্ত করবে ভেবে পাচ্ছিলনা। নিঃশব্দে সুস্মিতাদির দিকে তাকিয়ে তার দুঃখকষ্টের পরিমাপ করতে চাইছিল সে।

নীরবতা ভাঙ্গলেন সুস্মিতাদিই। শান্ত ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে তাকে কথা বলতে দেখে মৃদুলার মনে হল অনেকদিন তাকে এমন ভাবে কথা বলতে দেখেনি।

—কাল অনেক রাতে মত্ত অবস্থায় গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে পিনাকী। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা গেছে। ভুবনেশ্বরীর কাছে ধাক্কাটা খাওয়ার পর মদ্যপানের মাত্রাটা খুব বেড়ে গিয়েছিল আজকাল। দিন রাত মানতনা। সব সময়েই টইটুম্বুর থাকত। চেহারাও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

মৃদুলা বুঝতে পারছিল কিছু একটা বলা দরকার। শোকের মুহূর্তে দুঃখের মুহূর্তে সান্ত্বনা চায় মানুষ। দুঃখের উপশম খোঁজে সহানুভূতির মধ্যে। কিন্তু অনেক কাছে থেকে অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সান্নিধ্য পেয়েছে সে সুস্মিতাদির। তার হৃদয় নিংড়ানো হাহাকারের অনেক কান্না শুনেছে বহুদিন। মৃত মানুষের প্রতি রাগ পোষণ করা স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়েনা। তার সঙ্গে যতদিন দেখা হয়েছে পিনাকীদা ভদ্র শোভন আচরণই করেছেন। তবু অনেক দিন ধরে অনেক কিছু দেখে শুনে তার মনে পিনাকীদার সম্পর্কে যে বিতৃষ্ণা আর বিরূপতার আস্তরণ পড়েছিল তা তার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর খবর শুনেও অপসারিত হোলনা। তার নিজেরই অবাক লাগছিল ভেবে যে কোন পরিচিত লোকের মৃত্যুর খবর শুনে স্বাভাবিকভাবে যে অনুভূতি হয় তা সে কিছুতেই বোধ করছেনা আজ।

সুস্মিতাদির আজ কোন কিছুই লক্ষ্য করার অবস্থা নয়। মৃদুলা বুঝতে পারছিল নিজের মনের ভার নামাতেই ছুটে এসেছেন তিনি তার

কাছে। অনেক দিনের অনেক গ্লানি, অপমান, লজ্জা আর দুঃখের যে দুঃসহ বোঝা বয়ে চলেছেন তিনি তা অতর্কিতে এক হ্যাচকা টানে এভাবে যে নামিয়ে দেওয়া হোল তা মেনে নিতে পারছেননা। যেন এই বোঝাটাতে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে এটা সরে যাওয়াতে নিরালম্ব বোধ করছেন। হোক গ্লানিময়, তবু এতদিন তার জীবনের যে অর্থ ছিল তা এখন মিথ্যা হয়ে গেছে। একেবারে অর্থহীন হয়ে গেছে তার জীবন। জীবনের অপার অর্থশূন্যতা তাকে এভাবে গিলে খেতে এসেছে দেখে যেন অসহায় বোধ করছেন তিনি।

সুস্মিতাদির প্রশ্নেই ব্যক্ত হোল সেই অসহায়তা।

—আমি এখন কি করব বলতে পারিস মৃদুলা ? পিনাকী নেই এ যে আমি ভাবতেও পারছিনা রে। এতদিন তবু তো মাঝে মধ্যে চোখের দেখাটা দেখতাম। কিন্তু আর যে হাজার মাথা খুঁড়েও ওকে দেখতে পাবনা আমি।

বলতে বলতে আর সামলাতে পারলেননা সুস্মিতাদি। হাউ হাউ করে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। মৃদুলা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এত সবের পরও সুস্মিতাদির মনে পিনাকীদার জন্য এত ভালবাসা রয়ে গেছে। সে নিজের চোখে দেখেছে দিনের পর দিন পিনাকীদা কত অবিচার অন্যায় করে গেছেন। সুস্মিতাদির নির্ভেজাল ভালবাসা ত্যাগ কিভাবে মিথ্যা হয়ে গেছে তার অকৃতজ্ঞ অমানবিক আচরণে। সুস্মিতাদির চোখের জল, হৃদয়ের জ্বালা এত সহজে সে ভুলে যাবে কি করে ? বহুদিনের বহু ঘটনা, বহু দৃশ্য তার মনের পর্দায় গেঁথে আছে এখনও। সুস্মিতাদির এরকম প্রতিক্রিয়া তার কাছে শুধু বিস্ময়করই নয়, অভাবনীয়ও বটে। সে জানে গাণিতিক সূত্রে মানবমনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে এতখানি সৃষ্টিছাড়া খামখেয়ালী নীতিতে সে চলবে এ যেন ভাবা যায়না কোন মতেই।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল অসহ্য যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে একটি ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করেছিলেন সুস্মিতাদি। যত কটুই শোনাক, সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হয়নি তার কাছে সুস্মিতাদির মানসিক প্রতিক্রিয়া। মনের সীমাহীন জ্বালা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি সেদিন।

—ও মরে না কেন বলতে পারিস ? ও মরলে বিধবা হতাম। তবু

আমার সম্মান বাঁচত। এভাবে সমাজ সংসারের কাছে বেইজ্জত হতে হোতনা। আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি আজকাল বুঝলি ? বলি আমার সব কষ্ট জুড়োবে ও মরলে।

আশ্চর্য সেই একই লোক আজ এত অধীর হয়ে পড়েছে ? ওর মনে হোল সুস্মিতাদি কি ভুলে গেছেন একদিন কত বড় সাংঘাতিক কথা উচ্চারণ করেছিলেন তিনি নিজের মুখে ? অথচ তখনও আইনের ছাড়াছাড়ি হয়নি। তা সত্ত্বেও হিন্দু মেয়ের সব সংস্কার ভুলে স্বামীর মৃত্যুকামনা করেছিলেন দ্বিধাহীন ভাষায়।

তাহলে কি আমাদের নিজেদের কাছেও মনের পরিমাপ অজানা থেকে যায় ? পরে নানা ঘটনার আবর্তনে একটু একটু করে তার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে ?

আশ্চর্য ! সুস্মিতাদি নিজেই স্মরণ করলেন সেকথা। চোখের জল মুছে অপরাধীর ভঙ্গীতে মৃদুলার দিকে তাকিয়ে নিজের বিবেকযন্ত্রণা ব্যক্ত করলেন তিনি।

—আমি তো কথার কথা বলেছিলাম, মৃদুলা। আমি কি মন থেকে চেয়েছিলাম ও চলে যায় এভাবে ? ঈশ্বর অন্তর্যামী। তবু আমার মুখের কথাটাই শুনলেন তিনি ? মনের কথাটা শুনলেননা ?

এই প্রশ্নের জবাব হয়না। মৃদুলা সে চেষ্টা করলনা। কিন্তু এতক্ষণ ধরে তার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা উত্তাল হয়ে উঠছিল তা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল আগল ভেঙ্গে।

—সুস্মিতাদি, আপনার সঙ্গে তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে পিনাকীদার কবেই। তবু আপনি এত ভেঙ্গে পড়েছেন কেন ? আপনার সঙ্গে তো কবে থেকেই পিনাকীদার সম্পর্ক নেই।

মৃদুলা দেখল সুস্মিতাদি যেন অবাক হয়ে গেলেন তার প্রশ্ন শুনে। তার কণ্ঠস্বরে, তার চোখের দৃষ্টিতে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল সেই বিস্ময়।

—তুই বলছিস কি মৃদুলা ? আইনের ছাড়াছাড়িই কি সব ? দুটো মানুষের সম্পর্ক কি অত সহজে চলে যায় ? আর ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি শুধু এ জন্মের ? এ কত জন্মের সম্পর্ক আমাদের। তোকে বলিনি ওকে প্রথম দেখার মুহূর্তেই আমার কি মনে হয়েছিল ? মনে হয়েছিল ও যেন আমার অনেক কালের চেনা।

একটু থামলেন কথাগুলো বলে। পরে স্মৃতিচারণের মত আনমনা ভঙ্গীতে বললেন—অনেক কিছু ঘটেছে। ও আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছে। তবু ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক মিথ্যে হয়ে যায়নি। কিন্তু আমি এখন কি করব? আমি যে বড় আশা করে বুক বেঁধেছিলাম। ভেবেছিলাম, ও আবার ফিরে আসবে আমার কাছে। আবার আমরা নতুন করে সুরু করব জীবন।

নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছিলনা মৃদুলা। এও কি সম্ভব? যে সম্পর্ক কবেই চুকে বুকে গেছে তা আবার সত্যিই জোড়া লাগানোর কথা ভেবেছিলেন সুস্মিতাদি? সেরকম ঘটনা যে একেবারেই ঘটেনা তা নয়। তার জন্য আগ্রহী হতে হয় দুপক্ষ্যকেই। কিন্তু পিনাকীদা তো একেবারেই পিছনে ফিরে তাকাননি? কি করে সম্ভব হোত দুজনের সেই গ্রন্থিবন্ধন? কিন্তু এখন এসব সংশয়ের কথা বলার অর্থই হয়না। মৃত্যু এসে চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে দুজনের। সুস্মিতাদির নাগালের বাইরে চলে গেছেন পিনাকীদা বরাবরের মত। নিষ্ঠুরভাবে একা হয়ে গেছেন সুস্মিতাদি। তার প্রত্যাশা, স্বপ্ন, ভবিষ্যতের কল্পনা সব তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

সুস্মিতাদির দিকে তাকিয়ে বুকটা টনটন করতে থাকে মৃদুলার।

—সুস্মিতাদি আমি সরবৎ করে দিই। বড় গরম। আমার এখানেই যা হোক দুটো খেয়ে বিশ্রাম করুন। আর যদি অসুবিধা মনে না করেন, কয়েকটা দিন থেকেও যেতে পারেন আমাদের কাছে। একটু মনটা ভাল থাকবে।

রাজী হলেননা সুস্মিতাদি।

—নানা, অসম্ভব। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার। আর আমি এখন কোথায়ও থাকতে পারবনা। আমার অশান্তি অন্যদেরও অশান্তি হবে কেন? তোরা আমায় থাকতে বলিসনা, মৃদুলা। আমি কি আর দশটা মানুষের মত আছি?

মৃদুলা আর পীড়াপীড়ি করলনা থাকার জন্য। সুস্মিতাদির কথা উড়িয়ে দেবার নয়। আর দীপঙ্করও পছন্দ করেনা তাকে। এখানে সুস্মিতাদি থাকলে হিতে বিপরীত হওয়ারই কথা। সুস্মিতাদির মনে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতেই সে থাকার কথা বলেছিল। ভেবেছিল দীপঙ্করকে বুঝিয়ে বলবে। সুস্মিতাদির মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা

করে রাগ করতে পারবেনা ও। কিন্তু সুস্মিতাদির অনিচ্ছা দেখে সে আর জোর করলনা। তবে আরও খানিকক্ষণ বসিয়ে রাখল জোর করেই। সরবৎ করে দিল। সাধাসাধনা করে দুটো মিষ্টিও খাওয়াল। নিজেও খেল ইচ্ছা করে। এটা সেটা অন্য প্রসঙ্গ তুলে চেষ্টা করল সুস্মিতাদির মনকে অন্য দিকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু ঘুরে ফিরে সুস্মিতাদির মুখে খালি পিনাকীদার কথা। খালি অনুতাপ আর অনুশোচনা। যেন তিনিই দায়ী পিনাকীদার অপঘাত মৃত্যুর জন্য।

মৃদুলা ভেবেছিল চুপ করে থাকবে। এসব বলে যদি শান্তি পান তাহলে দরকার কি প্রতিবাদ করে? কিন্তু পরপর কয়েকবার একই ধরনের কথা শুনে তারও যেন ধৈর্যচ্যুতি হোল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে গেল মনের কথা।

—আপনি কেন নিজেকে দায়ী করছেন সুস্মিতাদি? আপনার কি-ই বা করণীয় ছিল এ ব্যাপারে?

সুস্মিতাদি মেনে নিলেননা। পিনাকীদার মৃত্যু শুধু পিনাকীদাকেই সরিয়ে নিয়ে যায়নি। সরিয়ে নিয়ে গেছে তাকে কেন্দ্র করে সুস্মিতাদির মনের সব অভিযোগ, ক্ষোভ আর জ্বালাময় নীচতাও। মৃদুলার কথা শুনে জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

—আমি রাগে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। কি না বলেছি কি না করেছি? ওকেও তো শান্তিতে থাকতে দিইনি? পুরুষ-মানুষের এরকম চরিত্রদোষ থাকেই। তা নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হয়েছে? পিনাকীকে দোষ দেব কি? আমিও কি স্বাভাবিক আচরণ করেছি? অথচ একটু যদি ধৈর্য ধরে থাকতাম তাহলে হয়ত এমন পরিণতি ঘটতনা। আমার কাছে যদি মানসিক আশ্রয়টা পেত তাহলেও বুঝি এমনটা হোতনা। আমার মাথায় যে কি দুষ্ট সরস্বতী ভর করেছিল তখন! মনের মধ্যে খালি আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলেছে প্রতিশোধের ইচ্ছা। ভেবেছি আমি কেন একা কষ্ট পাব? ওর কৃতকর্মের দায় ও কেন বইবেনা?

স্বগতোক্তি করে চলেছেন যেন সুস্মিতাদি। মৃদুলা নিঃশব্দে শুনে যেতে থাকে। সুস্মিতাদিকে দীর্ঘকাল ধরে চেনে ও। জানে এখন যদি ও প্রতিবাদ করে তাহলে উনি ক্রুদ্ধ হবেন। হয়ত বা বলে বসবেন ওদেরও দায় কম না। ওরা কেন ওঁকে বোঝায়নি? কেন দুজনের

মধ্যে সমঝোতা আনার চেষ্টা করেনি? সম্পূর্ণ অন্য সুরে অন্য খাতে বইবে তখন কথার স্রোত। এসবে বড় ভয় তার। সুস্মিতাদির স্বভাবে মাত্রাজ্ঞানের অভাব সে প্রত্যক্ষ করেছে বহুবার। বুদ্ধি করে নিজেকে কিছুটা আলগা রেখে পরিস্থিতির সামাল দিয়েছে সে এতদিন।

একটু পরে উঠে দাঁড়ালেন সুস্মিতাদি।

—উঠি, মৃদুলা।

মৃদু বাধা দিতে চেষ্টা করল মৃদুলা।

—আর একটু পরেই নয় যাবেন, সুস্মিতাদি। বড় গরম। বাইরে রোদ্দুরের তাপ আর একটু কমুক। একটু শুয়ে বিশ্রাম করে পরে যাবেন।

রাজী হলেননা সুস্মিতাদি।

—কি হবে এই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রেখে? আমি আর বাঁচতে চাইনা রে। কার জন্য বাঁচব বলতে পারিস? আমার নিজের বলতে কে আছে সংসারে? স্বামী নেই, সন্তান নেই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগও তেমন নেই। একটা জীবন এভাবে আর কতদিন টেনে চলব? ভাবছি চাকরি ছেড়ে দেব।

—চাকরি ছাড়বেন? চাকরি ছাড়লে থাকবেন কি নিয়ে? নানা সুস্মিতাদি। চাকরি ছাড়বেননা। বরং দরকার মনে করলে ছুটি নিন।

নিজের বিস্ময় গোপন রাখতে পারেনা মৃদুলা।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরে তাকান সুস্মিতাদি। তীব্র দুঃখের মুহূর্তে যেমন করে আলগা হাসি হাসে মানুষ, তেমন এক হাসি ঝিলিক দেয় তার মুখে।

—চাকরি থেকে শুধু নয়। জীবন থেকেও ছুটি নিতে পারলে ভাল হোত রে!

দারুণ ত্রাসে একরকম আর্তনাদ করে ওঠে মৃদুলা।

—কি বলছেন আপনি? এসব কথা একদম চিন্তা করবেননা সুস্মিতাদি। আমরা তো আছি। আমাদের সান্নিধ্যেও কি কিছুটা সহনীয় করে তুলতে পারেননা আপনার দুঃখকষ্ট? আপনিই না একদিন বলেছিলেন সময় সবচেয়ে বড় ওষুধ। সময়ে অনেক কিছুই ঠিক হয়ে যায়।

—এখন আর সে জোর খুঁজে পাচ্ছিনা রে! আমার কথা থাক।

তোরা ভাল থাকিস। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোদের জীবনে যেন আমার মত আগুনের আঁচ না আসে।

সুস্মিতাদি চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে আবার বইটা টেনে নিল মৃদুলা। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারলনা। ঘুরে ফিরে বারবার মনে হতে লাগল সুস্মিতাদির কথা। গত পনর বছর ধরে এই মানুষটাকে কত ভাবে, কি ভাবে, কি ভঙ্গীতে দেখেছে, সেকথাই হানা দিতে লাগল বারবার তার মনে।

মনে পড়ে গেল তার জীবনের অনেক ঘটনা। অনেক সুখদুঃখের দৃশ্য। সুস্মিতাদির সম্পর্কে অনেকের মন্তব্য। সুস্মিতাদির বিবাহ-পূর্ব জীবন, বিবাহিত সুখী দাম্পত্য জীবন, আর পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিভুজ কাহিনীর ছকে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা। অনেক শোক দুঃখ বিষাদ হতাশার অবিস্মরণীয় প্রতিক্রিয়ার অনেক দৃশ্য আলোড়িত ঢেউয়ের মত কম্পিত হতে থাকে তার মনে। একটু পরে সেই আন্দোলন থিতিয়ে এলে আবার স্পষ্ট করে ভেসে ওঠে পরপর ছবির মত আগের সব ঘটনা

দুই

দুর্গাপুরের স্টিল প্ল্যান্টের সেই স্কুলে গ্রন্থাগারিকের কাজ পেয়ে বর্তে গিয়েছিল যেন মৃদুলা। যাদবপুর থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা নিয়ে বসেছিল বছর দুয়েক। এখানে ওখানে চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়েও লাভ হয়নি। অভিজ্ঞতার অভাব দেখিয়ে অনেক সাক্ষাৎকারেই নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল তার আবেদন। চাকরি না পেলে অভিজ্ঞতা হবে কি করে এই সহজ তত্ত্বটুকুও বুঝতে চাননি মোটা মোটা ডিগ্রীধারী ব্যক্তিরা। দুর্গাপুরের এই স্কুলে চাকরি পেয়ে তাই খুশীর সীমা ছিল না মৃদুলার। মা আপত্তি করেছিলেন। একমাত্র মেয়েকে কাছছাড়া করতে মন তার চায়নি। মৃদুলা অনেক করে বুঝিয়েছিল। মাথার ওপরে বাবা বর্তমান নেই। দাদা ও ছোট ভাই দুজনেই নিজের নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে অতিসজাগ। তাদের স্বার্থপরতা পীড়াদায়ক পর্যায়ে

পেঁাছে যায় মাঝে মাঝেই। দুজনেই বিবাহিত। মৃদুলারও কবেই বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু যতগুলি সম্বন্ধ এসেছে তার একটাও পছন্দমত ছিলনা। সে মত দেয়নি দেখে ভাইরাও কেউ সন্তুষ্ট ছিলনা।

ইতিমধ্যে আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ছোট ভাইয়ের এক বন্ধু তার প্রতি বিশেষ রকম মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। সে নিজেও বুঝতে পারছিল তার দুর্বলতা জন্মাচ্ছে ছেলেটির প্রতি। কিন্তু বয়সের প্রশ্নটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সর্বতোভাবে উপযুক্ত হোলেও একমাত্র ঐ কারণেই সে ছেলেটিকে মেনে নিতে পারছিলনা। তার সংস্কার সে ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছোট ভাইয়ের বন্ধু হিসাবে যে একদিন তাকে মৃদুলাদি বলে সম্বোধন করেছে, তাকে প্রেমিক কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে স্বামী বলে ভাবতে অসুবিধা হচ্ছিল তার। অথচ ছেলেটির কাছে ওটা কোন বাধাই নয়। নিজের মনে দুর্বলতা না থাকলে ভয়ের কোন কারণ ছিলনা। কিন্তু মৃদুলা বুঝেছিল তার হৃদয়ের গভীরে কিছুমাত্র সায় ছিলনা সেই সংস্কারের। নিজের যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় নিয়ে পালাতে চাইছিল সে নিজের কাছে থেকেই। আর কেউ সেটা না বুঝলেও সেই ছেলেটি কিন্তু বুঝেছিল। যাবার আগের দিন মৃদুলার সঙ্গে দেখা করেছিল। মৃদুলা একরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিল তার কথা শুনে।

—তুমি কোথায় পালাবে? কতদিন পালিয়ে থাকবে? দেখ শেষ পর্যন্ত পালাতে পারবেনা তুমি আমার কাছে থেকে।

দুর্গাপুরে এসে প্রথম প্রথম মন টিকত না। মনটা হু হু করত কলকাতার জন্য, মায়ের জন্য, বন্ধুবান্ধবদের জন্য আর অবশ্যই সেই ছেলেটির জন্য। কষ্ট ভুলে থাকার জন্য নিজেকে ডুবিয়ে রাখত সে বইয়ের জগতে। ছাত্রাবস্থায় কতটুকুই বা ছিল তার পড়াশোনার পরিধি? এখানকার লাইব্রেরিতে কাজ পেয়ে দেশী বিদেশী অসংখ্য ভাল ভাল বই নাগালের মধ্যে পেয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল সে। বই পড়ার এত নেশা যে তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তা সে নিজেই জানতনা। লাইব্রেরির কাজে এই বাড়তি সুখ তাকে যেন আবিষ্ট করে তুলল মনে প্রাণে। শুধু ভাল ভাল বই নয়, পরিচয় হোল তার বই পড়ুয়াদের সঙ্গেও। ঘনিষ্ঠতা হোল সুস্মিতাদি আর অনসূয়াদির সঙ্গে। সুস্মিতাদি তখনও বিয়ে করেননি। অনসূয়াদির কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে

দুর্গাপুরেই কর্মরত একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বভাবে প্রচণ্ড অমিল থাকা সত্ত্বেও। তবে বই পড়তে ভালবাসতেন দুজনেই। আর বই দেয়া নেওয়ার সূত্রেই আলাপ হয়ে গেল মৃদুলার দুজনের সঙ্গে। ক্রমশঃ অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হোল। তবে ঘনিষ্ঠতা বেশি হোল এই দুজনের সঙ্গে।

কিছুদিনের মধ্যেই মৃদুলা লক্ষ্য করল স্কুলে সুস্মিতাদির বন্ধুর তুলনায় প্রতিপক্ষের সংখ্যাই বেশি। অনেকেই নিন্দা করে তার। ফলে সুস্মিতাদির সঙ্গে তার নিজের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগেই সে জেনে গেল সুস্মিতাদির অনেক দোষ। তার স্বভাবে অসংখ্য ছিদ্রপথের সন্ধান আগেই জানিয়ে দেওয়া হোল। যারা বিশেষ উদ্দেশ্যে সেই চেষ্টা করেছিল তারা ভাবতে পারেনি ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। মৃদুলা প্রথম থেকেই সাবধান হয়ে গেল। সুস্মিতাদির সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা রইলনা সেই কারণে

শুধু তাই নয়। যারা তার নিন্দা করেছিল তারা তার অনেক গুণাবলীর কথা ইচ্ছা করেই উল্লেখ করেনি। একটু একটু করে সেগুলি ধরা পড়তে লাগল মৃদুলার চক্ষে। একটি প্রতিভাসম্পন্ন গুণী মানুষও যে অনেকের কত অপ্রিয় হতে পারে তা সুস্মিতাদিকে না দেখলে ধারণাই করতে পারতনা সে।

সবচেয়ে অবাক লাগল তার সুস্মিতাদির মধ্যে বৈপরীত্যের সমাবেশ দেখে। একটি মানুষের মধ্যে যে এতগুলি পরস্পরবিরোধী অনুভূতি কিংবা হৃদয়বৃত্তি সহাবস্থান করতে পারে তা ঐ মানুষটির সঙ্গে পরিচয় না হলে জানতে পারতনা সে কোনদিন। হয়ত তার নিজেরও অসুবিধা হোত সুস্মিতাদির সঙ্গে মানিয়ে চলতে।

কিন্তু সুস্মিতাদি কেন জানি প্রথম থেকেই বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতে সুরু করলেন তাকে। তার বাৎসল্যের ছোঁয়ায় সম্পর্ক তৈরি হতে দেরি হলোনা। অনেকের কাছেই তা বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। অনসূয়াদিরও কিছু ভূমিকা ছিল সেই সম্পর্ক তৈরির পেছনে। স্কুলে সুস্মিতাদির একমাত্র বন্ধু ছিলেন অনসূয়াদি। একমাত্র তার কাছেই অকপটে মনের ভাব ব্যক্ত করতেন সুস্মিতাদি। অনসূয়াদির বিয়ের পরও সেই ঘনিষ্ঠতায় ভাঁটা পড়েনি। স্বামী যতই অপছন্দ করুন

অনসূয়াদি নির্মম হাতে সরিয়ে দিতে পারেননি বন্ধুকে তার মন থেকে। শত অন্যায় আবদার সহ্য করেও টিঁকিয়ে রেখেছেন বন্ধুত্ব।

অনসূয়াদির কাছেই মৃদুলা শুনেছে যে কর্মজীবনের গোড়ায় অনেক অন্য রকমের ছিলেন সুস্মিতাদি। আজকের অনেক দোষত্রুটি দেখা যায়নি তখন তার মধ্যে। সময়ের সাথে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মোকাবিলা করতে গিয়ে একটু একটু করে পালটে গিয়েছেন তিনি। আজকের অসহিষ্ণুতা, কলহপ্রিয়তা কিংবা পরশ্রীকাতরতা নাকি তখন একেবারেই ছিলনা তার স্বভাবে। অনসূয়াদি নিজের মুখে মৃদুলাকে বলেছেন যে মাঝে মাঝে তার বন্ধুকে দেখে বিস্ময় বোধ হয়। মনে হয় দুষ্ট প্রেতাত্মা এসে ভর করেনি তো তার ওপরে?

সুস্মিতাদির কোয়ার্টার্সের কাছেই কোয়ার্টার্স পেয়েছিল মৃদুলা। প্রায়ই হুটহাট করে চলে আসতেন তিনি মৃদুলার বাড়ি। মাঝে মাঝে চিঠি আসত মৃদুলার। কখনও মায়ের কাছে থেকে, কখনও বা সেই ছেলেটির কাছে থেকে। মায়ের চিঠির উত্তর দিত সে যথাসময়েই। কিন্তু ছেলেটির চিঠির উত্তর দিতনা ইচ্ছা করেই। ততদিনে মন অনেক শক্ত করে নিয়েছে সে। দুর্বলতার বীজ অঙ্কুরেই নষ্ট করবে বলে কৃতসংকল্প হয়েছে।

তার মনে আছে একদিন একটি চিঠি নিয়ে পড়ছিল সে। সেবারের চিঠি অনেক দীর্ঘ ছিল। চিঠিটা এসেছিল সকালেই। তখন স্কুলে যাবার তাড়া থাকায় না পড়েই সেটা রেখে দিয়েছিল। স্কুল থেকে ফিরে গা টা ধুয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অলস মন্থর ভঙ্গীতে পড়ছিল সেটি। এই অভ্যাস আয়ত্ত করেছে সে অনেক চেষ্টায়। প্রথম প্রথম তীব্র হৃদয়াবেগে অস্থির বোধ করত সে এই চিঠি পেলে। ক্রমশঃ চেষ্টা করে নিজের মধ্যে শান্ত সুস্থির ভাব নিয়ে এসেছে।

সুস্মিতাদিকে দরজা খুলে দিয়েছিল তার কাজের মেয়েটি। অন্যবারের মত সেবারের চিঠিতে জোর জবরদস্তির সুর ছিলনা। বিষণ্ণ, করুণ, অসহায় এক আর্তি ফুটে উঠেছিল চিঠির ছত্রে ছত্রে। অন্যবার মদমত্ত পৌরুষের প্রকাশ সে যেভাবে প্রতিহত করতে পেরেছে সেবার তা পারেনি। একজনের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয় দেখে তার নিজের হৃদয়ও অজান্তে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল।

সে এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে সুস্মিতাদি যে কখন ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলে এসে তার পাশে বসে পড়েছেন তা খেয়ালই করেনি। সুস্মিতাদি তার হাত থেকে চিঠিটা টেনে নিয়ে দ্রুত পড়ে ফেললেন কয়েক ছত্র। বাধা দিতে গিয়েও পারলনা মৃদুলা। ধরা পড়ে গিয়েছে সে আগেই। লজ্জার আর বাকি আছে কি?

সুস্মিতাদি চিঠি পড়া শেষ করে তার দিকে তাকিয়ে দেখেন এক মুহূর্ত। মৃদুলা লজ্জা পাচ্ছিল। চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছিলনা। সে ভেবেছিল সুস্মিতাদি রসিকতা করবেন, কৌতুক করবেন। বলবেন, 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছিল?'

কিন্তু সেসবের ধারে কাছেও না গিয়ে আধো অন্যমনস্ক আধো গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'ছেলেটিকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন মৃদুলা? এ তুমি ঠিক করছনা। চিঠি পড়ে বুঝলাম তোমার দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছেনা। আমার মনে হয় হাঁ-না যাহোক কিছু জানিয়ে দেওয়া উচিত তোমার। শুধু শুধু একটি ছেলে তার সময়, মন, জীবন নষ্ট করবে কেন?'

মৃদুলা বুঝতে পারছিলনা কতটুকু বলা উচিত সুস্মিতাদিকে। তখন আলাপ বেশি দিনের ছিলনা। সমস্যার চেহারাটা দেখাতে তার কেমন যেন লজ্জা হচ্ছিল।

সুস্মিতাদির প্রশ্নে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা।

—ছেলেটিকে অপছন্দ তোমার?

কথাটা আদৌ তা নয়। তা যদি হোত তাহলে আর এত টানাপোড়েন কেন? কিন্তু সত্যি কথা বললে পাল্টা প্রশ্ন আসবে। তখন সব কিছু না বলে কি পার পাবে সে?

মৃদুলা চুপ করে আছে দেখে একটু অসহিষ্ণু হয়েই প্রশ্নের পুনরুক্তি করেছিলেন অন্যভাবে।

—ছেলেটিকে ভাল লাগেনা তোমার?

—না তা নয়। তবে ওকে মেনে নেওয়ার কতগুলো অসুবিধা আছে।

আমতা আমতা করে জবাব দিয়েছিল মৃদুলা। তখনও মন ঠিক করতে পারেনি সব কিছু খুলে বলবে কি না? পর মুহূর্তে সুস্মিতাদির মন্তব্য শুনে নিরস্ত্র হয়ে পড়ল সে। একটু আবিষ্ট গলায় প্রায় স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে সুস্মিতাদি অনেক কিছু বলেছিলেন।

—যথার্থ প্রেম অমূল্য সম্পদ। তাকে অবহেলা করতে নেই। সাত রাজার ধন এক মাণিকের মত জীবনভোর তাকে খুঁজতে হয়। সন্ধান পেলে মাথায় করে বুকে করে রাখতে হয়। জীয়নকাঠির মত এর ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠি আমরা। আবার মরণকাঠির মত ভয়ঙ্কর সর্বনাশও ডেকে আনতে পারে তা। হতাশায় যন্ত্রণায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে মানুষ।

মৃদুলার বুকের ভেতরটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল। বিকেল থেকেই সমস্ত পরিবেশ কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। দীপঙ্করের চিঠির সুর ও সুস্মিতাদির কথা তাকে দুর্বল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতেছে যেন।

সুস্মিতাদিকে বোঝাতে চাইল মৃদুলা।

—আমি কি করব সুস্মিতাদি? ওকে আমি অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু ও বুঝতে চায়না। বলে বয়স কোন বাধা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপনিই বলুন, একদিন যে আমাকে দিদি বলে ডেকেছে তার সঙ্গে কি করে আমি অন্য রকম সম্পর্ক তৈরির কথা ভাবি?

সুস্মিতাদির জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল মৃদুলা। সম্পূর্ণ অন্য দিক দিয়ে ভাবছেন উনি ব্যাপারটা। বয়সের কথাটা যেন গৌণ। ওটা আদৌ কোন সমস্যা নয় যেন। এতটা আধুনিক সংস্কারমুক্ত বলে ভাবতেই পারেনি সে সুস্মিতাদিকে। সুস্মিতাদি তার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই আশ্চর্য কথাটি বলেন।

—তুমি তো ভালবাস ছেলেটিকে? তাহলে এত বাধা আসছে কেন? আমাকে খুলে বল মৃদুলা। ব্যাপারটা পুরো না জানলে মতামত দেব কি করে?

সব কিছু খুলে বলেছিল তখন মৃদুলা। সুস্মিতাদি সমর্থন করেননি তাকে। পরোক্ষে তিরষ্কারই করেছিলেন তার দ্বিধাগ্রস্ততার জন্য।

স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য জানিয়েছিলেন।

—তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার মতামত দেওয়ার অর্থ হয়না। তবে আমি হলে একটুও দ্বিধা করতামনা। এটুকুই শুধু বলতে পারি। আসলে আমার মনে হয় তোমার মধ্যেই কোন ঘাটতি

আছে। ছেলেটি তোমায় যতটা ভালবাসে তুমি ওকে ততটা ভালবাসনা। যদি বাসতে তাহলে কোন বাধাই বাধা হোতনা।

তখন থেকেই চমৎকৃত হতে সুরু করেছিল মৃদুলা। প্রেমকে যে এভাবে সম্পূর্ণ অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় তা সে ভাবতেই পারেনি। সুস্মিতাদি তাকে যেন চমকে দিয়েছিলেন। মৃদুলা অবাক হয়ে ভেবেছিল মানুষটার চিন্তাভাবনা তো গতানুগতিক ধারা ধরে চলেনা? এতটা আধুনিক মৌলিকতাসম্পন্ন চিন্তাভাবনা যে থাকতে পারে এই মানুষের তা সে আদৌ ভাবেনি।

পরবর্তীকালে নানা পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্য দেখেছিল সে সুস্মিতাদির মধ্যে। সেই সঙ্গে নিজের মধ্যেও পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া টের পেয়েছে। মুগ্ধতা আর বিতৃষ্ণা, শ্রদ্ধা আর অনুকম্পার 'টাগ-অব-ওয়ার' চলেছে তার মধ্যে। কিন্তু সেদিন তার মন জুড়ে খালি বিস্ময়-জড়িত সম্ভ্রমবোধই প্রবল হয়ে উঠেছিল।

সুস্মিতাদি তাকে বেশ কয়েকটা কড়া কথা বলেছিলেন। এখনও স্পষ্ট মনে আছে সেগুলি।

—তুমি নিজেকে অনেক বেশি ভালবাস। তাই লোকের কথা, সংস্কারের কথা এসব ভাবতে পারছ। নিজের ভাবমূর্তিটাকে বাঁচিয়ে রাখা তোমার কাছে অনেক বেশি জরুরী বলে মনে হচ্ছে।

মৃদুলার ভালো লাগেনি কথাগুলো। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতে গিয়ে সুস্মিতাদির যুক্তিজালে জড়িয়ে পড়েছিল সে বেশি করে। সুস্মিতাদি আবার সেই এক কথা বলেছিলেন।

—তুমি যাকে দৃঢ়তা ভাবছ, আত্মসংযম ভাবছ আসলে সেটা তোমার একটা ঘাটতি। স্বার্থবোধের ঊর্ধ্বে উঠে ভালবাসতে পারছনা। পারলে দেখতে জগৎসংসারের ভ্রূকুটি পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। ভালবাসার মানুষের জন্য না করতে পারে মানুষ এমন কোন কাজই নেই।

এই একটি বিষয়ে সুস্মিতাদির মনোভাবে কোন বৈপরীত্য ছিলনা। তার জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দুটি ছিল প্রেম। তিনি যা কিছু করেছেন, আবার যা কিছু করেননি তার সব কিছুরই মূলে আছে এই প্রেমচেতনা। মৃদুলা তার স্বভাবে বারে বারে নানা অসংগতি দেখেছে। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে সংগতির অভাব কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি।

তার মনে আছে সেদিন তার একটু রাগ হয়েছিল। নিজের মধ্যে

একটা অহঙ্কারের জায়গায় যদি কেউ হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে কিংবা আত্মপ্রবঞ্চনা করছে তাহলে সেটা মেনে নিতে কম অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সে গোঁজ হয়ে বসেছিল। সুস্মিতাদি তার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাকে বুঝিয়েছিলেন।

—নিজের অভিজ্ঞতার জোরেই কথাগুলো বলতে পারছি। তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্য যে বলছিনা তা বিশ্বাস করতে পার।

মৃদুলা তখনও কিছু বলেনি। সে বুঝেছিল সুস্মিতাদি তার কাছে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবেন। এর মধ্যে লোকমুখে সে শুনেছিল যে সুস্মিতাদি এক ভদ্রলোককে ভালবাসেন। কিন্তু বাবার অমত আছে বলে তাকে বিয়ে করতে পারছেননা।

সুস্মিতাদি সেই সন্ধ্যায় তার জীবনের সেই পরম অধ্যায়টিকে তার চোখের সামনে হাজির করেছিলেন। মৃদুলার সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অকপটে খুলে বলেছিলেন পিনাকীদার কথা।

কাহিনী সুরু করেছিলেন তিনি প্রথম সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত থেকে। সেই ঘটনার মধ্যেও একটা অলৌকিকের ছোঁয়া এনেছিলেন সুস্মিতাদি। কণ্ঠস্বর অসাধারণ সুরেলা ছিল তার। মৃদু লয়ে সেই সুরেলা কণ্ঠস্বরে ভাবার দ্যুতি ছড়িয়ে একটি আশ্চর্য কাহিনী কিংবা হয়ত আশ্চর্য নয়—শুধু তার বর্ণনাভঙ্গীতে আশ্চর্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল সেটি—বর্ণনা করেছিলেন তার কাছে।

মৃদুলা শুনেছিল সুস্মিতাদির বাবা পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। একাধিক বড় কোম্পানিতে দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন তিনি। বাংলাদেশে জমিদারী ছিল পূর্বপুরুষের। দেশবিভাগের পর কলকাতায় এসে বি. টি. রোডের ধারে সস্তায় বাড়ি শুদ্ধ ভাল জমি পেয়ে কিনে ফেলেন সেটি।

দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সুস্মিতাদি ছিলেন বাবার সবচেয়ে আদরের। দিদি সকলের বড়। অনেক আগে বাংলাদেশে থাকতেই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। জামাইবাবু রংপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী। এখনও তারা সেখানে আছেন। দুই দাদা কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করত। পড়াশোনা শেষ করে ছোড়দা আমেরিকা গেছে।

ডাক্তার হিসাবে ভাল নামডাক হয়েছে তার সেখানে। দাদা পেশায় বাবার মত ইঞ্জিনিয়ার। বছর দুয়েক আগে নিজের পছন্দমত একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে তারা। কলকাতায় এসে সেখানেই উঠেছিলেন প্রথমে সুস্মিতাদিরা। কিন্তু ছোট ফ্ল্যাটে স্থান সংকুলান হওয়া বড়ই মুশকিল। দালাল লাগিয়ে সুরু হোল জমি বাড়ি খোঁজা। শেষ পর্যন্ত বি. টি. রোডের বাড়িটি পছন্দ হোল। দাম কম, আশেপাশে ফাঁকা। ঘিঞ্জি না।

মেয়েকে নিয়েই এসেছিলেন সুস্মিতাদির বাবা বাড়ি পছন্দ করতে। সেদিনই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল উল্টো দিকের বাড়ির পিনাকী বোসের সঙ্গে। দেখামাত্র বিচিত্র এক অনুভূতি টের পেয়েছিলেন মনে পনর বছরের সুস্মিতাদি। তার মনে হয়েছিল কত জন্মের চেনা যেন ঐ ছেলেটি। অতি সাধারণ চেহারার ছেলেটিকে দেখে তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। চুম্বকের মত অদৃশ্য এক শক্তি তাকে কেবলি আকর্ষণ করছিল ছেলেটির দিকে। মৌখিক আলাপ হয়েছিল পরে। কিন্তু বৈশাখ মাসের সেই বিকালে অদৃশ্য এক সূত্রে বাঁধা পড়েছিলেন তিনি ছেলেটির সঙ্গে।

স্মরণীয় সেই বিকালে তার মনে কোন্ কোন্ অনুভূতির তরঙ্গ উৎক্ষেপ হয়েছিল তা কোনদিন বিস্মৃত হননি তিনি। অনেক পরে মৃদুলার কাছে নিজের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে নিজের মুখেই প্রকাশ করেছিলেন সেটি।

বাড়ি কেনার পর বসবাস সুরু করলেন সুস্মিতাদিরা। বাড়িতে স্থায়ী বাসিন্দা তিন জন। সুস্মিতাদি আর তার বাবা মা। দাদা বৌদি মাঝে মাঝে এসে থেকে যায়। আর আছে দুটি কাজের লোক। একজন রান্নাবান্না সামলায়। অপর জন যাবতীয় ঘর গৃহস্থালীর কাজকর্ম সারে।

সুস্মিতাদির মায়ের শরীর কোনদিনই খুব ভালো ছিলনা। কলকাতায় এসে আরও খারাপ হয়ে পড়ল। বছর চার পাঁচ পরে নতুন বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

মুখোমুখি বাড়ির সেই ছেলেটির সঙ্গে ইতিমধ্যে ভাল রকম আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছে সুস্মিতাদির। সত্যি কথা বলতে কি তিনিই উপযাচিকা হয়ে আলাপ করেন। সুস্মিতাদির বাড়ির সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল পিনাকীদের বাড়ির। টালির ছাদ দেওয়া দুটি মাত্র

ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকত পিনাকীরা ছয় ভাই বোন আর তাদের বাবা মা। মেয়েরা কেউ লেখাপড়া করতনা। পিনাকীও পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরত কিংবা তাদের সঙ্গে তাসের আড্ডা দিত। পড়াশোনার ধার ধারতনা। তার দুই দাদার কেউই তেমন লেখাপড়া শেখেনি। একই কারখানায় সামান্য মাইনের কাজ করত। বাবার ছিল পাড়ার মধ্যেই পান বিড়ির দোকান।

এক কথায় শিক্ষায় দীক্ষায় মান মর্যাদায় একেবারেই সুস্মিতাদিদের পরিবারের মত নয়। পিনাকীও সেজন্য প্রথম দিকে সমীহের চোখেই দেখত সুস্মিতাদিকে। বয়সে সুস্মিতাদি এক বছরের ছোট হলেও তাকে সম্মান করে কথা বলত।

সুস্মিতাদি চেষ্টা করে সেই জড়তা, সেই আড়ষ্টতা কাটিয়েছিলেন একটু একটু করে। পিনাকীদের বাড়িতে কিন্তু সুস্মিতাদিকে পছন্দ করত সকলেই। সুস্মিতাদি সেই বাড়িতে গেলে হাতে স্বর্গ পেত তারা। কিন্তু সুস্মিতাদির বাবা আদৌ পছন্দ করতেননা সেই মেলামেশা। কাজের লোকেরা পর্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখত পিনাকীদের বাড়ির লোকেদের।

মা মারা যেতে সুস্মিতাদিকে চোখে চোখে রাখার লোক থাকলনা। সেই সুযোগে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে থাকেন তিনি পিনাকীদের সঙ্গে। বয়সে এক বছরের বড় হয়েও তখন পর্যন্ত স্কুলের গণ্ডী পার হয়নি পিনাকী বোস। সুস্মিতাদি ততদিনে বি.এ. পাশ করে বাংলা নিয়ে এম. এ. পড়ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিনাকী বোসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত স্কুলের গণ্ডী পার করালেন। বাধ্য করলেন কলেজে পড়তে।

মেধা কম ছিলনা পিনাকী বোসের। কিন্তু পড়াশোনায় ফাঁকিবাজ ছিল বলে পরীক্ষায় তেমন ভাল করতনা। সুস্মিতাদির আগ্রহে, তার উৎসাহে, তার সহযোগিতায় পিনাকী বোস পাল্‌টে যেতে লাগল একটু একটু করে। শেষ পর্যন্ত বাংলা নিয়ে এম. এ. পাশ করল সে।

ততদিনে দুর্গাপুরে চাকরিজীবন সুরু হয়ে গেছে সুস্মিতাদির। এই কয়েকটা বছর পিনাকী বোসের যাবতীয় খরচ চালিয়েছেন তিনি। দুজনের সম্পর্ক আর লুকোনো ছিলনা। সুস্মিতাদির বাবা দাদা কিছুতেই মেনে নিলেননা পিনাকী বোসকে। অত্যন্ত আদরের মেয়ের জন্য ভাল সম্বন্ধ এনেছিলেন সুস্মিতাদির বাবা। কিন্তু দৃঢ়ভাবে একের

পর এক নাকচ করে দিলেন সুস্মিতাদি সেগুলি। বাবার অমতে বিয়ে করলেননা ঠিকই। কিন্তু বাবার ইচ্ছেমত অন্য পাত্রকেও বিয়ে করতে রাজী হলেননা।

মেয়েকে ধমক ধামক, তিরস্কার, অনুরোধ সব অস্ত্র প্রয়োগ করে দেখলেন। কিন্তু সব নিষ্ফল হলো। মেয়েরও গোঁ কম না। দাদা বৌদিও বোঝালেন। মাঝখানে ছোড়দা কলকাতা ঘুরে গেলেন দু' বার। আমেরিকায় বসবাসকারী উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান দিলেন তিনি। কিন্তু কোন লাভ হলোনা।

পিনাকী বোসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করলেননা সুস্মিতাদি। দুর্গাপুরে গিয়েও অব্যাহত রইল সেই যোগাযোগ। ছুটিছাটায় কোলকাতায় এলে দেখা করতেন পিনাকী বোসের সঙ্গে। পিনাকী বোসও দুর্গাপুরে এসে দেখা করত সুস্মিতাদির সঙ্গে। এখন পিনাকী বোস ঘোষকের চাকরি পেয়েছে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে। তাছাড়া মাঝে মাঝে নাটক পরিচালনা করে, অভিনয় করে। অল্প সময়ের মধ্যে নিজের একটা ভাল স্থান করে নিয়েছে সে। অনেকেই চেনে তাকে।

তবু বিয়ে করতে পারলেননা তাকে সুস্মিতাদি। কারণ বাবার মত নেই। তিনি দুঃখ পাবেন। বাবাকে কম ভালবাসেননা সুস্মিতাদি। বাবার মনে কষ্ট দিয়ে পিনাকীকে বিয়ে করতে চাননা তিনি। দরকার হলে এভাবেই কাটিয়ে দেবেন একটা জীবন। কিন্তু একবার যাকে স্বামী বলে ভেবেছেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারবেননা কিছুতেই।

এত ঘটনা জানা ছিলনা মৃদুলার। একাধিক প্রসঙ্গে পিনাকী বোসের নাম সে শুনেছে আগে। রেডিওতে তো বটেই। সহকর্মীদের মুখেও তার নামোল্লেখ কানে গেছে। দুর্গাপুরে মাঝে মধ্যে এসে কয়েকদিন করে থেকে যান নাকি ভদ্রলোক। তা নিয়ে কথা চালাচালি হয়েছে কম না। দুজন অবিবাহিত নারী পুরুষের এক বাড়িতে রাত্রিবাস লোকে ভাল চক্ষে দেখেনা। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কতদূর নির্দোষ পর্যায়ে থাকে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে অনেকেই। বিশেষতঃ তাদের মধ্যে যদি প্রেমের সম্পর্ক থাকে তাহলে তো কথাই নেই। বাড়িতে অপর কেউ থাকলে তবু ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াতে পারে।

শোনা যায় সুস্মিতাদি নাকি কয়েকটা দিন লুকিয়ে রাখেন পিনাকী

বোসকে। সেই কদিন ঠিকা লোকটাকেও ছুটি দিয়ে দেন। ভদ্রলোককে দুর্গাপুরে আসতে দেখে অনেকেই। তারপর আর তার টিকির খোঁজ পায়না কেউ।

এসব কথা কানে এসেছে মৃদুলার। কিন্তু মাঝখানে যে এতসব ঘটনা ঘটে গেছে তা সে জানতনা। অনসূয়াদি অবশ্য একদিন বলেছিলেন যে সুস্মিতার মতো অত নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারে খুব কম লোকই। বন্ধুর তরফে অতিশয়োক্তি বলেই ধরে নিয়েছিল সেটা মৃদুলা। সুস্মিতাদির নিজের মুখে তার বাল্য প্রণয়ের কাহিনী শুনে সে বুঝতে পারল অতিশয়োক্তি করেননি অনসূয়াদি। সত্যিই এমন ভালবাসা দুর্লভ।

সুস্মিতাদির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে সে অকপটে স্বীকারোক্তি করেছিল।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা সতিাই ভালবাসতে জানিনা। অহং বাদ দিয়ে ভালবাসার কথা ভাবতেই পারিনা। আমাদের মধ্যে সত্যিই অনেক ঘাটতি আছে।

একটু যেন লজ্জা পেয়েছিলেন সুস্মিতাদি তা শুনে।

—এসব কথা থাক। আমার কথা শোন। ছেলেটিকে শুধু শুধু কষ্ট দিও না। যদি ওকে সত্যিই ভালবাস তাহলে একমাত্র বয়সের কারণে বাতিল করে দিওনা।

মৃদুলা তার অক্ষমতা ব্যক্ত করেছিল।

—আমি আপনার মত পারবনা সুস্মিতাদি। আমার পক্ষে কোন-মতেই সম্ভব না ছোট ভাইয়ের বন্ধুকে বিয়ে করা। আমার বাড়িতে তো বটেই, পাড়ার লোকেও কি ছেড়ে কথা কইবে?

—তাহলে তুমি কি করবে? অন্য কাউকে বিয়ে করবে?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তখন সুস্মিতাদি।

মৃদুলা স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছিল।

—বিয়ে করবনা আমি। সকলকে বিয়ে করতে হবে এমন কোন কথা নেই। চলে যাবে একটা জীবন।

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে তার হাত টেনে নিয়েছিলেন সুস্মিতাদি।

—তাই নাকি? দেখি তোমার হাতটা?

পরক্ষণেই গম্ভীর বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলেন।

—বিয়ে করবেনা মানে? দু' দুবার বিয়ে হবে তোমার। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার হাতে।

আরও একটুক্ষণ উল্টেপাল্টে হাতটা দেখেছিলেন। মুখে আর কিছু বলেননি। পরে হাতটা ছেড়ে কেমন এক সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন মৃদুলাকে। ভারী অস্বস্তি বোধ হয়েছিল তার। সেই মুহূর্তে সুস্মিতাদির মুখেচোখে অপার্থিব এক ক্ষমতার স্ফুরণ ঝলসে উঠতে দেখেছিল সে। কিন্তু তার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে। দু' দুবার বিয়ের ভবিষ্যৎবাণী তার কানে আদৌ শ্রুতিমধুর ঠেকেনি। রসিকতা বলে মনে করতে পারত সে কথাটা। কিন্তু সুস্মিতাদি তার কোন সম্ভাবনা রাখলেননা। তিনি নির্মমভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে তার কথা মিথ্যা হবেনা। মৃদুলার ভাগ্যে যা লেখা আছে তা ঘটবেই। সত্যিই তার দুটি বিয়ে হবে।

সেই ঘটনার পর কয়েকটা দিন সুস্মিতাদিকে একরকম ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে যেত মৃদুলা। ইতিমধ্যে সুস্মিতাদির ভবিষ্যৎবাণীর যথার্থতা বা তার অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার আরও কিছু প্রমাণ সে পেয়েছে। তার মনে হয়েছে সুস্মিতাদির কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। কোন অনুমানের কথাও যদি তার মুখ দিয়ে বেরোত তাহলে তা সত্যি হতো কয়েকদিন পর।

মৃদুলা তার কার্যকারণ খুঁজে পেতনা। ব্যাখ্যার অতীত বলে ব্যাপারগুলো নিয়ে মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করত। তবে সুস্মিতাদিকে তখন থেকেই সে অস্বস্তিমিশ্রিত সমীহের চোখে দেখতে সুরু করেছিল।

দীপঙ্কর সুস্মিতাদিকে একেবারেই পছন্দ করেনা। মৃদুলা বোঝে তার জন্য সে নিজেই অনেকটা দায়ী। সুস্মিতাদির সমস্যা, তার দুঃখ, ক্ষোভ আর অশান্তির কথা সে মাঝেমাঝে ব্যক্ত করেছে দীপঙ্করের কাছে। বর্জন কিংবা সংযোজনের কথা না ভেবে যা শুনেছে তার সবটাই অকপটে নিবেদন করেছে।

ফল খুব ভাল হয়নি। সুস্মিতাদিকে ঘিরে দীপঙ্করের মনে সৃষ্টি হয়েছে একটা বিরূপতা। অথচ দীপঙ্করের হয়ে তার কাছে কম ওকালতি করেননি তিনি। তখন ওকে চিনতেননা। তবু ভালবাসার

কথা শুনে বারবার তাকে অনুরোধ করেছেন সংস্কারাবদ্ধ হয়ে যেন অবিচার না করে সে তার প্রতি। দীপঙ্করকে বহুবার সে বলেছে সেকথা। তবু যেন তার মনের বিরূপতা যাবার নয়।

অতীতের অনেক কথা মনে পড়ছিল মৃদুলার। দুর্গাপুরে আসার আগে দীপঙ্করের ব্যাকুলতা, তার অভিমান, ক্ষোভ সব মনে পড়ছিল নতুন করে। সুস্মিতাদির সঙ্গে একটা সূত্রে জড়িয়ে আছে সেই সম্পর্ক। সুস্মিতাদির কথা ভাবতে ভাবতে স্মৃতির অনুষঙ্গ হয়ে মনে পড়ল নিজের দুঃখময় অতীতের কথা।

দীপঙ্করের মনোভাব জানার পর তাকে অনেক দিন ঠেকিয়ে রেখেছিল সে। নাছোড়বান্দার মত তবু তার পিছনে পড়ে ছিল দীপঙ্কর। মৃদুলা তাকে এড়িয়ে গেছে, তার চিঠির জবাব দেয়নি, কখনও বা রূঢ় আচরণ করেছে তার সঙ্গে। অটুট বিশ্বাসে তবু তাকে আঁকড়ে থেকেছে দীপঙ্কর। দুর্গাপুরে এসে পর্যন্ত হানা দিয়েছে। মৃদুলার দাদা বৌদি আর ছোট ভাই ও ভাইয়ের বৌ পর্যন্ত তা নিয়ে কম অসন্তোষ ব্যক্ত করেনি। কোন কিছু গ্রাহ্য করেনি দীপঙ্কর।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে চরম রাস্তা বেছে নিল মৃদুলা। বাড়িতে জানাল সে বিয়ে করবে। তার জন্য সম্বন্ধ দেখা হোক। বাড়ির সকলে তা শুনে খুশিই হোল। তারা ভাবল অবাঞ্ছিত উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। দাদা বৌদি, ছোট ভাই, তার বৌ পর্যন্ত তৎপর হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত অনেক দেখে শুনে একটি সম্বন্ধ বেছে নেওয়া হোল। ছেলের চেহারা ভাল। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। একটি বড় কোম্পানিতে আছে। দায়দায়িত্ব প্রায় কিছুই নেই। দুই ভাই, বোন নেই। দাদাও ভাল চাকরি করেন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে। তার একটি মাত্র ছেলে। থাকার মধ্যে আছেন বাবা মা। দুজনেরই বয়স হয়েছে। তবে বাবাও ভাল পেন্সন পান। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করতেন আগে।

সব খবরাখবর দিয়ে মৃদলাকে কলকাতায় আসতে বলা হোল। তার ছবি দেখে আগেই পছন্দ করেছে ছেলের বাড়ির লোকেরা। এখন শুধু সশরীরে দেখার অপেক্ষা।

মাঝখানে দু'তিন দিন ছুটি পড়েছিল। তার সদ্ব্যবহার করে মৃদুলা কলকাতায় এল। মেয়ে দেখার পর্ব শেষ হলো। মৃদুলা ভাল করে

দেখলও না ছেলেকে। মনে মনে সে আদৌ আগ্রহী ছিলনা বিয়েতে। খানিকটা যন্ত্রচালিত ভঙ্গীতে সব কিছু করে যাচ্ছিল মাত্র। দীপঙ্করকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণ চাইছিল। বিবাহই সে ব্যাপারে সর্বোত্তম পন্থা বলে মনে হয়েছিল তার।

মৃদুলার চেহারা সুন্দর ছিল। মুখশ্রী খুব সুন্দর না হলেও তার গাত্রবর্ণ, উচ্চতা ইত্যাদি আর দশজনের তুলনায় অনেক ভাল ছিল। ছেলেপক্ষ অত্যন্ত বেশি রকমের আগ্রহ দেখিয়েছিল। মেয়েপক্ষও অরাজী নয়। মৃদুলা তো তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নিয়েছিল। মোটামুটি তাড়াতাড়িই পৃথ্বীশ বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মৃদুলার।

বিয়ের দিন বরকে দেখে কয়েকজন ফিসফিস করে কি সব বলছিল। মৃদুলার সেটি চোখে পড়েছিল। কিন্তু নিজে তার কারণ বোঝেনি। বুঝল দু'দিন পরে।

পূর্ববঙ্গে বাসরপ্রথা চালু নেই। বিয়ের দিন ক্রিয়াকর্ম চুকে গেলে পর বর কনে একত্রে থাকার অনুমতি পায়। অবশ্য দাদার মেয়ে ছিল সেই ঘরে। গভীর রাত্রে যথারীতি সেই ছোট মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছিল। পৃথ্বীশ বিশ্বাস সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এগিয়ে এলে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল মৃদুলা। পূর্বপরিচয়হীন একজন পুরুষমানুষের প্রথম রাত্রেই সেই অগ্রসরণ প্রচেষ্টা তাকে একই সঙ্গে বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত করে তুলেছিল। কিছুটা আশঙ্কিতও। পৃথ্বীশের হাতটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে মিনতি করেছিল সে।

—প্লীজ, আজ না।

মৃদলার চোখে পড়েছিল, অদ্ভুত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে পৃথ্বীশ। সাপের মত হিম নিষ্পলক সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করে শরীরে মনে বিচিত্র এক অস্বস্তি টের পেয়েছিল সে। পৃথ্বীশ অবশ্য সেরাতে আর জোর করেনি।

ফুলশয্যার রাতে কিন্তু মৃদুলার আপত্তি গ্রাহ্য করেনি পৃথ্বীশ। এখনও সেকথা মনে পড়লে গা শিরশির করে তার। মৃদুলা হয়ত সেদিন মেনে নিত। কিন্তু আগের মুহূর্তে তার সঙ্গে পৃথ্বীশের যে সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়েছিল তা নতুন করে তার মনকে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল।

তাদের বাড়ির দেওয়া থোওয়া নিয়ে কথা তুলেছিল পৃথ্বীশ। দু'চারটে কটু মন্তব্য সহযোগে। মৃদুলার মনটা বেসুরো বাজছিল

তারপর থেকে। পৃথ্বীশের সঙ্গে তার আলাপ নেই। আলাপ থাকলে হয়ত অতটা ধাক্কা লাগতনা তার মনে। প্রথম আলাপের সুর তাল লয় যেমনটা হওয়া উচিত তেমন হয়নি। অতএব যথার্থ পরিবেশ তৈরি হয়নি।

সেই কারণেই মৃদুলার শরীর মন প্রচণ্ড বিদ্রোহ করেছিল। পৃথ্বীশকে বাধা দিয়েছিল সে। পৃথ্বীশ তা মানতে চায়নি। প্রথম রাতে প্রতিহত হয়ে চুপ করে ছিল সে উপায়ান্তর ছিলনা বলে। তাবলে সেদিনও সে মৃদুলার আপত্তি মেনে নেবে তা হতে পারেনা।

পৃথ্বীশ যেন ক্ষিপ্ত হয়েই জোর করতে গেল। কিন্তু মহামায়ার শক্তি ভর করেছিল সেদিন মৃদুলার শরীরে। সজোরে তাকে ঠেলে সরিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

পরের ঘটনা আরও নাটকীয়। জায়ের ঘরে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিয়েছিল সে। অবাক হয়ে গিয়েছিল তার জা তাকে দেখে। মৃদুলা বলেছিল 'আমার ভয়ানক শরীর খারাপ লাগছে।' আরও অবাক হয়ে তার জা বলেছিল 'বিশুকে বলোনি?' পৃথ্বীশের ডাক নাম বিশু। কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে ছিল মৃদুলা। তাকে দেখে হয়ত তখন আঁচ করতে পেরেছিল তার জা ব্যাপারটা। স্বামীকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে মৃদুলাকে শুতে দিয়েছিল তার ঘরে।

পরদিন ভোর বেলায় আরেকটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল। দাঁড়ি কামাচ্ছিল পৃথ্বীশ। সেই মুহূর্তে গায়ে জামা ছিলনা তার। মৃদুলা যে অত সকালে তখনই ঘরে ঢুকবে তা হয়ত ধারণা করতে পারেনি সে। দরজার শব্দ হতেই চমকে চোখ তুলে তাকায় সে। একটু অপ্রস্তুত আর তার সঙ্গে বিরক্তও দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু মৃদুলা ভীষণভাবে চমকে গেল দেখে। সারা শরীরে চাকা চাকা লাল দাগ পৃথ্বীশের।

অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটি প্রশ্ন।

—ওগুলো কিসের দাগ? কি হয়েছে আপনার?

দ্রুত জামা পরে নিয়ে গ্রস্ত চকিত গলায় জবাব দেয় পৃথ্বীশ।

—ও কিছুনা। ঠাকুর সারিয়ে দেবেন।

মৃদুলার মনে হয়েছিল ব্যাপারটা সামান্য নয়। কিছু একটা গুরুতর অসুবিধার ব্যাপার আছে। পৃথ্বীশের ভয়, লজ্জা আর বিরক্তি প্রকট হয়ে পড়েছিল তার চোখের দৃষ্টিতে, তার ভীত গ্রস্ত আচরণের মধ্যে।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। মৃদুলা রাজী হয়নি পৃথ্বীশের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে। খুবই সতর্ক হয়ে কাটিয়েছে সে দ্বিরাগমনের আগের সময়টুকু। ইচ্ছা করেই মুখ খোলেনি। দ্বিরাগমনের সময় সেই যে এসেছিল সে পৃথ্বীশের সঙ্গে বাপের বাড়ি, তারপর আর ফিরে যায়নি শ্বশুরবাড়ি।

বাড়িতে সকলের কাছেই ব্যক্ত করেছিল সে তার সন্দেহ আর সংশয়ের কথা। বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিল যেন সকলে। পৃথ্বীশকে সব জানিয়ে বলা হোল যে সে যদি তাদের সঙ্গে গিয়ে তাদের পরিচিত কোন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করায় আর ডাক্তারের রিপোর্টে কোন ত্রুটি না পাওয়া যায় তাহলেই মৃদুলা যাবে স্বামীর ঘর করতে। অন্যথায় বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনবে মৃদুলা।

বলাবাহুল্য পৃথ্বীশ রাজী হয়নি। সে একা ফিরে গিয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাসের গতি ধরাবাঁধা পথে। মৃদুলারা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল সিফিলিস আছে পৃথ্বীশের। অনেক সূত্র থেকেই খবর পাওয়া গেল পৃথ্বীশের অনেক কুঅভ্যাস ছিল। জানা গেল তার অতীত জীবনের কথা। নিয়মিত বেশ্যালয়ে যেত সে। অনেকের সঙ্গে সহবাসের ফলে দেখা দিয়েছে তার এই কুৎসিত সিফিলিস রোগ। একজন চিকিৎসকের কাছে যাতায়াতও সুরু করেছে সে রোগ নিরাময়ের জন্য। কিন্তু যৌন ব্যাধির কথা লুকিয়ে বিয়ে করেছিল যে মৃদুলাকে।

সব শুনে মৃদুলার একটি কথাই বারবার মনে হোল। ভাগ্যের চাকা কি বিচিত্র কুটিল পথেই না চলে! শেষ পর্যন্ত এত খবর পাওয়া গেল। কিন্তু বিয়ের আগে তার কোনও আভাসই মিললনা। নিয়তি কেন বাধ্যতে? তার অদৃষ্টে এমনটা ঘটবে বলেই সব কিছু পরপর ঘটে গেছে এভাবে।

ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাস সত্ত্বেও তার মনে হোল বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে। ফুলশয্যার রাতে যদি পৃথ্বীশকে প্রতিরোধ করতে না পারত, যদি তার চোখে সব কিছু ধরা না পড়ত তাহলে তার অদৃষ্টে কি না ঘটত। একদিনের জন্যও যে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেনি সেটা কি তার কম সৌভাগ্য?

বিয়ের রাতে নিমন্ত্রিতদের অনেকেই পৃথ্বীশকে দেখে ফিসফিস করেছিল। সব কিছু পরে বোধগম্য হয়ে উঠল তার কাছে। কেবলি

মনে হতে লাগল বাড়ির লোকেরা আর একটু সময় নিয়ে কি খোঁজখবর করতে পারতনা ?

পরবর্তী দেড় দুই বছরের ইতিহাস বড় দুঃখের ইতিহাস। বিয়ের জন্য ছুটি নিয়ে দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় এসেছিল মৃদুলা। ছুটি ফুরোলে পর সব সম্পর্ক ছেদ করে বিচিত্র এক অবস্থায় ফিরে আসল সে দুর্গাপুরে।

তাকে নিয়ে যে অনেক রকম আলোচনা হচ্ছে তলে তলে তা সে বুঝল। এতদিন তার বিশেষ মূল্য ছিল লোকচক্ষে। বিয়ের পরবর্তী ঘটনার জন্য সেই মূল্য কমে গেল। সরাসরি অনেকেই তা নিয়ে আলোচনা করলনা। কিন্তু মনে মনে যে তারা অনেক কিছু ভেবে বসেছে তা তাদের হাবভাব দেখেই বুঝতে পেরেছিল মৃদুলা।

একমাত্র অনসূয়াদি আর সুস্মিতাদিই খোলাখুলি আলোচনা করে জেনে নিলেন সব কিছু। সান্ত্বনা দিলেন, উপদেশ দিলেন। সমব্যথী হয়ে তার কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করলেন।

সেই সময়ে সুস্মিতাদি আরেকবার তার ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

—এবার তোমার যে বিয়ে হবে তাতে সুখী হবে তুমি। বলেছিলাম না হাতে দু'বার বিয়ের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমি ?

আগের বারের মত এবারও ভাল লাগলনা মৃদুলার সুস্মিতাদির কথা। কিন্তু প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে হজম করে নিল তার গরলটুকু। মনে মনে সে বদ্ধসংকল্প যে আর বেলতলায় হাঁটবেনা। বিয়েতে অরুচি হয়ে গেছে তার। এভাবেই কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনটা।

নামে তার বিবাহ হয়েছে মাত্র। আসলে সে তো কুমারীই। পুনর্বার বিবাহে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। তবু লোকচক্ষে সেটি দ্বিতীয় বিবাহ বলেই গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় বিবাহ এখনও পর্যন্ত খুব সম্মানজনক নয় অপরের চক্ষে। অতএব সুস্মিতাদির কথা শুনে তার মনে হচ্ছিল আর সে লোক হাসাতে চায়না।

কিন্তু সে না চাইলে কি হবে ? দীপঙ্কর নাছোড়বান্দা। অনেকবার হাঁটাহাঁটি করল সে দুর্গাপুরে। মৃদুলাকে বোঝাল অনেক করে। শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল মৃদুলা। দীপঙ্কর সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করে তার প্রতিরোধের ক্ষমতা নিঃশেষ করল। সুস্মিতাদিও তাকে কম

বোঝাননি। তিনি বললেন মৃদুলা তার নির্বন্ধ খণ্ডাবে কি করে? গোয়ার্তুমি না করলে সব কিছুই অন্যরকম হতে পারত। অবশ্য যা ঘটার তাই ঘটেছে। মৃদুলার গোয়ার্তুমি হয়ত উপলক্ষ মাত্র।

শেষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করল দীপঙ্কর আর মৃদুলা। একমাত্র মা ছাড়া মৃদুলার বাড়ির অন্য কেউ প্রথমে মেনে নিলনা বিয়েটা। দীপঙ্করের বাড়িতে কিন্তু এতটুকুও ঝামেলা হোলনা। সহজভাবেই মেনে নিল তারা সব কিছুই।

সময়ের সাথে সাথে মৃদুলার বাড়িতেও মেনে নিল দীপঙ্করকে। এখন তো দীপঙ্কর তাদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ মোটা টাকা উপার্জন করে সে। সল্ট লেকের এই ছিমছাম ফ্ল্যাটটিও কিনেছে সে ভাল পয়সা দিয়ে। শ্বশুর বাড়িতে শালা, শালার বৌ, তার ছেলে কিংবা শ্বাশুড়ীর জন্য এটাসেটা নিয়ে যায় সে প্রায়ই। মাঝে মাঝে সল্টলেকের বাড়িতে তাদের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ণেও ত্রুটি রাখেনা দীপঙ্কর।

মৃদুলা ভাবছিল সুস্মিতাদির ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল তার ক্ষেত্রে। আরও কয়েকজনের বেলাও অনুরূপভাবে সুস্মিতাদির ভবিষ্যংবাণী সত্য হতে দেখা গেছে। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তার কোন আভাস কি দেখতে পাননি তিনি নিজের হাতের রেখায়? অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারেননি তার জীবনের টালমাটাল অবস্থা?

দীপঙ্কর সুস্মিতাদিকে অস্বীকার করলে কি হবে? সে তো জানে তার মনকে কতটা প্রভাবিত করেছিলেন সুস্মিতাদি? কিভাবে তাকে সাহস শক্তি জুগিয়েছিলেন? কিন্তু তাদের কথা থাকুক। এখনও পর্যন্ত ভাল আছে তারা। অত্যন্ত ভাল। তাদের দাম্পত্য জীবন অনাবিল সুখের স্রোতে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অপর কোন পুরুষকে স্বামী হিসাবে মনোনীত করলে জীবন কি এতখানি ভরপুর হয়ে উঠত?

সুস্মিতাদি বলেছিলেন তারা সুখী হবে। তা ফলে গেছে। এখনও পর্যন্ত গুরুতর কোন সমস্যা চাগিয়ে ওঠেনি। কিন্তু সুস্মিতাদির জীবন কেন এরকম হোল? কেন তা সর্বতোভাবে বরবাদ হয়ে গেল?

অথচ কি না ছিল তার? বিদ্যা, মেধা, প্রতিভা, কর্মক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, অর্থ কোনটারই তো কমতি ছিল না?

অনেক ঘটনা মনে পড়ছিল তার। অনেক দৃশ্য ঝলসে উঠছিল চোখের সামনে। বালিশে মাথা এলিয়ে শুয়ে শুয়ে আপন মনে বিভোর হয়ে ভাবতে থাকে মৃদুলা সুস্মিতাদির কথা, পিনাকীদার কথা, ভুবনেশ্বরীর কথা।

তিন

লাইব্রেরিতে আলাপের সূচনা হলেও মৃদুলা মুগ্ধ হয়েছিল আরও পরে। স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হোত খুব সমারোহ করে। তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন সুস্মিতাদি।

যেবার মৃদুলা স্কুলে যোগদান করে সেবার সে সুস্মিতাদিকে একাধারে অনেক ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে দেখেছিল। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ কুন্তী হয়েছিলেন সুস্মিতাদি। স্কুলের লাইফ সায়েন্সের একজন শিক্ষক হয়েছিলেন কর্ণ। অনবদ্য আবৃত্তি করেছিলেন সুস্মিতাদি। মৃদুলার কানে মহাভারতের সেই কাহিনী নতুন ঢেউ তুলেছিল।

শুধু আবৃত্তি নয়, নাট্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও নিজের প্রতিভার কম স্বাক্ষর রাখলেননা তিনি। সঙ্গীত পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিবেশনেও কম দক্ষতা দেখা গেলনা তার। অপূর্ব কণ্ঠস্বর, তার সঙ্গে অপূর্ব গায়কী। দীর্ঘকাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করে যে ঐ ক্ষমতাটি অর্জন করেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। মৃদুলার মনে হচ্ছিল এই একটি মানুষ বহুরূপে বহু ভূমিকায় রবীন্দ্র পূজোয় মেতে উঠেছেন যেন।

কিন্তু দর্শকের আসনে বসে সুস্মিতাদির প্রশংসা করতে গিয়ে বাধা পেল সে কয়েক জনের কাছে।

অঙ্কের শিক্ষিকা নিবেদিতা হাজরা ঠোঁট বেঁকিয়ে তার মনের বিরাগ ব্যক্ত করলেন।

—ঐ ওটুকুই ভাল। মেশোনি তো! তাহলে বুঝতে কি চীজ!

মৃদুলাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে নিজের ভাষা

ব্যবহারের ত্রুটি বুঝেছিলেন। কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাই পরক্ষণে।

—কথাটা শুনতে খারাপ লাগছে তোমার বুঝতে পারছি। পরে বুঝবে এতটুকু মিথ্যে বলিনি।

সান্ত্বনা সমাদ্দার ইংরাজী পড়ায়। সেও সায় দিল নিবেদিতার কথায়।

—সত্যি, এই মুহূর্তে এই মহিলাটিকে দেখে কে বুঝবে এর আসল স্বরূপ? আমিও বুঝতামনা। কিন্তু এখন আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। কম জ্বালাতন ভোগ করিনি তো!

শর্মিষ্ঠা বোস ভূগোল পড়ায়। ভালমানুষ স্বভাবের। তার বোধ হয় খারাপ লাগল সকলকে এমন কটুকাটব্য করতে দেখে। সুস্মিতাদির পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এল সে।

—তোমরা শুধু দোষই দেখছ! গুণও কম নেই ওর।

হাঁ হাঁ করে সকলে মিলে গিলে খেতে আসল যেন তাকে।

সান্ত্বনা সমাদ্দার খুব দাপটের সঙ্গে জোরে ধমক দিল।

—তুই আশ্চর্য বাবা শর্মিষ্ঠা। তোকে ভালমানুষ পেয়ে কম শোষেনি সুস্মিতাদি। সেবার তোর শাড়ীটা পরতে নিয়ে আর মোটে ফেরতই দিলনা। কতবার তোর কাছে টাকা ধার নিয়ে পরে আর তা ফেরৎ দেয়নি। এত সবের পরও ঐ মানুষটার জন্য তোর মনে কি করে মায়া মমতা থাকতে পারে বুঝিনা বাপু।

শর্মিষ্ঠা কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিলনা। সকলের কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে বিদিশাকে ভালমানুষ পেয়ে সুস্মিতাদি যত রকমে পারে সুবিধা লুটেছে। মৃদুলার কাছে সব কিছুই খুব অদ্ভুত ঠেকছিল। একদিকে নিবেদিতা, সান্ত্বনা, হেনাদিরা, অন্যদিকে শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে তার মনের মধ্যে এক অভিনব টাগ-অব-ওয়ার চলছিল। বিরাগ, বিতৃষ্ণা আর অস্বস্তির সঙ্গে দড়ি টানাটানি করছিল বিস্ময়, মুগ্ধতা আর সপ্রশংস স্বীকৃতি।

সেদিন আরও অনেকের অনেক মন্তব্য কানে এসেছিল মৃদুলার। ভালমন্দ মিলিয়ে পরস্পরবিরোধী সেই সব মন্তব্য শুনে মৃদুলার মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। তখনও সুস্মিতাদির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। তার ধারণা তখনও ছিল ভাসাভাসা পর্যায়ে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা অপরের অভিজ্ঞতা বা ধারণার আলোকে মানুষটির কোন মূল্যায়ন তখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ঐ মহিলা যে খুবই বিতর্কিত ও আলোচিত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিলনা তার মনে। সে বুঝেছিল ঐ মানুষটির স্বভাব বা আচরণে এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য বারবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে হয় তাকে। কোন না কোন ভাবে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে উপস্থিত না হয়ে উপায় নেই ওর।

আর একটি জিনিষ অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়নি তার। এই মানুষটির বিরুদ্ধে অনেকের মনেই চাপা রাগ, বিদ্বেষ, ক্ষোভ আর তিক্ততা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। তার স্বপক্ষে কিছু বলার মত লোকের তুলনায় বিপক্ষে বলার মত লোকের সংখ্যা অনেক ভারী। এটা বুঝতে পেরেছিল বলেই আলাপের সেই প্রাথমিক পর্যায়ে সুস্মিতাদির জন্য নরম একটা জায়গা তৈরি হয়েছিল তার মনে। অজান্তেই একটা পক্ষপাতিত্ব বোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সুস্মিতাদিও প্রথম থেকেই তাকে সুনজরে দেখেছিলেন।

বহুবার মানসিক অসুবিধাও তাকে ভোগ করতে হয়েছে কম না। তবে সে সব আরও অনেক পরের কথা। প্রথম দিকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে সব কিছু লক্ষ্য করত সে। সুস্মিতাদি কি বলেন, অন্যরা তার সম্পর্কে কি বলে ইত্যাদি ভালভাবে লক্ষ্য করত।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর পর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সুস্মিতাদি ভাষণ দিয়েছিলেন। তার সুচিন্তিত বক্তব্য শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মৃদুলা! গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করে স্বাধীনতার মহিমা কীর্তনের চেষ্টা করেননি তিনি। সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বাধীনতা কথাটির প্রকৃত অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সামগ্রিক স্বাধীনতার ভগ্নাংশ মাত্র। অখণ্ড স্বাধীনতা লাভই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সমগ্র জীবনচর্যার মধ্যে তা আলোকবর্তিকার মত দিঙনির্দেশ করবে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

তিনি আরও বললেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে কোন ভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় মানসিক স্বাধীনতা। যে সব অসাধারণ

মানুষ দেশের স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তাদের আত্মত্যাগ আর স্বার্থত্যাগের চড়া মূল্যে কেনা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করছি কোথায় আমরা? তারা যে অনুকূল পরিবেশ এনে দিলেন তার সুযোগ নিয়েও আমরা কেন মনে প্রাণে স্বাধীন হতে পারছিনা? এখনও কেন অসংখ্য সংস্কারের নিগড়ে বাঁধা আমরা? কেন আমাদের মানসিকতা এখনও মান্ধাতা আমলের গতানুগতিক ভাবধারার গুরুভার পাষাণের চাপে বিকশিত হতে পারছেনা? স্বাধীনতার ফুলে ফলে পূর্ণ বিকশিত জীবনের স্বপ্ন এখনও কেন অধরা আমাদের? সমাজের সর্বস্তরে এখনও কেন বৈষম্য, অন্যায়, অবিচার? দুর্বল মানুষের কাছে ন্যায়নীতির সুফল এখনও কেন অপ্রাপনীয়?

বক্তৃতার উপসংহারে একটি সদৃপ্ত প্রশ্ন ছিল সুস্মিতাদির। সামগ্রিক বা পূর্ণতর অর্থে কজন মানুষ স্বাধীন? শ্রমিক-মালিক, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই কি কোন না কোন পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা নয়? অজ্ঞতা, অনুদারতা, অহঙ্কার, দর্প কিংবা স্বার্থপরতার শিকলে বাঁধা মনে প্রকৃত স্বাধীনতার স্ফূর্তি কই?

সুস্মিতাদি জোরালো ভঙ্গীতে খুব সুন্দর করে ব্যক্ত করেছিলেন তার স্বাধীনতা চিন্তা। সব কিছু হুবহু মনে নেই। সময় গড়িয়ে গেছে এর মধ্যে কম না। তবু আশ্চর্য, সারমর্মটুকু ঠিক মনে আছে এতদিন পরেও।

গতানুগতিক ভাষণের ধরাবাঁধা বক্তব্যের রাজপথ বাদ দিয়ে অন্য পথের সহযাত্রী হতে পেরে ভাল লেগেছিল তার। রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতা লাভ করলেই হবেনা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও একান্ত প্রয়োজন ইত্যাদি বক্তব্যের সঙ্গে সে পরিচিত দীর্ঘদিন ধরে।

কিন্তু মানসিক স্বাধীনতা যে সমস্ত স্বাধীনতার মূল উৎস বা মূল রক্ষাকবচ এই কথাটি আগে এমন সুন্দরভাবে কাউকে ব্যাখ্যা করতে শোনেনি সে। আমাদের অনেক মানসিক ত্রুটি যে আসলে আমাদের শৃঙ্খলিত করে রেখেছে সেকথা আগে সেভাবে অনুধাবন করতে পারেনি।

মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত মন নিয়ে ফিরেছিল সে অনুষ্ঠান থেকে। মাঝে মাঝে সহকর্মীদের শ্লেষাত্মক, বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যগুলি খচখচ করে বিঁধছিল তাকে। ঈর্ষাপ্রসূত নীচতার প্রকাশ বলে সেগুলিকে উড়িয়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারল

পরস্পরবিরোধী ভাবের এমন সমাবেশ খুব কম লোকের মধ্যেই আছে। একটু সজাগ মন নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে মৃদুলা বুঝতে পারল, যত গুণই থাক সুস্মিতাদির কিংবা যত প্রতিভাই, তার সান্নিধ্যে খুব আশ্বস্ত বোধ করা যায় না। এই মানুষটিকে কাছে টানতে গেলেও বাধা পেতে হয়। হঠাৎ কোন প্রতিক্রিয়ার ঝড় এসে যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সেই ইচ্ছাকে উৎপাটিত বৃক্ষের মত তা ভেবে বড় আশঙ্কা হয় মনে।

কিন্তু তার সঙ্গে সুস্মিতাদির বিরোধ বাঁধলনা। দোষের সঙ্গে সঙ্গে গুণগুলিকেও দেখতে পেয়েছিল বলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভারসাম্য বজায় রইল। তবু তার মনে আছে বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে সুস্মিতাদির আচরণে কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে।

খেলার উপসংহার হয়েছিল শিক্ষিকা আর ছাত্রীদের দড়ি টানাটানি খেলার মধ্যে। শক্তির পরীক্ষায় ছাত্রীরাই বিজয়ী হয়েছিল। দুই দলের প্রত্যেকেই একটি করে রুমাল পেয়েছিল। সুস্মিতাদি কিছুতেই সেই রুমাল নিলেননা। শুধু তাই নয়, তাকে ওটা নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে তিনি রেগে গেলেন রীতিমত।

—বলেছি না আমাকে রুমাল দেবে না? কেন এবছর রুমাল দেওয়া হোল? অন্যান্য বছর তো অন্য জিনিষ দেওয়া হয়। নিয়ে যাও রুমাল। ও আমার চাইনা।

মৃদুলা খুবই অবাক হয়ে গেল ওরকম তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে। অনসূয়াদির কাছে গোপনে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, সুস্মিতাদির নাকি দারুণ কুসংস্কার রয়েছে রুমালের ব্যাপারে। কারণ হিসাবে তার কাছে যে তথ্য পেল মৃদুলা তা যেমন বিচিত্র তেমনই অবিশ্বাস্য।

আসামের কামরূপ কামাখ্যায় নাকি কর্মসূত্রে বেশ কয়েক বছর ছিলেন সুস্মিতাদির বাবা। নানারকম তুকতাকের ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, তুকতাকের ওপর, ডাকিনী মায়ার ওপর কয়েকটা বই তার হাতে এসেছিল তখন। সেগুলি পড়ে জানতে পেরেছিলেন তুকতাক সম্পর্কিত নানা খুঁটিনাটি। রুমাল দিয়ে অনেকে নাকি তুকতাকের চেষ্টা করে। সেইজন্যই কারুর কাছে থেকে রুমাল নিতে তার এত ভয়, এত বিরক্তি।

অনসূয়াদি বললেন যে একবার তার একটা রুমাল ভাল লেগেছিল বলে তিনি খুশি হয়ে আধ ডজন রুমাল উপহার দিতে চেয়েছিলেন সুস্মিতাদিকে। কিন্তু সুস্মিতাদি ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন।

অনেক বলে কয়েও তাকে বাধ্য করানো যায়নি সেই উপহার গ্রহণে। কারণটা জানতেন না বলে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন তখন। পরে সুস্মিতাদি নাকি অনুতপ্ত হয়ে কারণটা ব্যক্ত করেছিলেন খোলসা করে।

অনসূয়াদির কাছে এসব বিচিত্র তথ্য জেনে বিস্ময়ের অন্ত থাকছিল না মৃদুলার। তার বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছিল প্রশ্নের মধ্যে।

—আপনারা যখন জানেন সুস্মিতাদি রুমাল নিতে ভয় পান তখন কেন ওকে বাধ্য করেন? এটা তো ঠিক নয়!

অনসূয়াদি বিব্রত হয়েছিলেন।

—মুশকিল কি জান? আমাদের মত দু'চারজন ছাড়া আর সবাই যে ওর বিরুদ্ধে। কি বলব তোমাকে মৃদুলা, কেউ কেউ দেখি ইচ্ছা করেই ওকে রাগাতে চায়।

সব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল মৃদুলা। শিক্ষিত মানুষগুলির মধ্যেও জান্তব নিষ্ঠুরতা দেখে তার মন বিষণ্ন হয়েছিল। কিন্তু প্রতিকারের উপায় জানা ছিলনা। অনসূয়াদির মত সেও তার প্রতিবাদ ব্যক্ত করত পরোক্ষভাবে। সুস্মিতাদির সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন আলগানা করে তাকে স্বীকৃতি দিতো।

অনেক সময় সুস্মিতাদির ব্যবহারে তার নিজেরও ধৈর্যচ্যুতি হোত। কিন্তু অন্যদের নিষ্ঠুরতার কথা মনে রেখে নিজেকে সে সংযত করত। সুস্মিতাদির বিরুদ্ধে বহুজনের মনের উষ্মা দূর করার উপায় জানা ছিলনা। কিন্তু নিজেদের মনের উষ্মা গোপন করে তার সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে তারা—সে ও অনসূয়াদি সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। মোক্ষম ছিল তাদের সেই অস্ত্র। তাদের জন্য সুস্মিতাদিকে পুরোপুরি বেইজ্জত করতে পারতনা কেউ ইচ্ছা থাকলেও।

সুস্মিতাদি সেটি বুঝতেন। নিজের মুখে তার স্বীকৃতি দিতেন। বহুবার দুঃখের মুহূর্তে তিনি সেকথাই বলেছেন।

—তোরা না থাকলে আমি পাগলই হয়ে যেতাম। প্রিন্সিপালের কথা বাদ দিলে আর সকলে তো একরকম আমার ঘোর শত্রু। কেবলি মনে হয় শত্রুপুরীতে বাস করছি।

সুস্মিতাদির কথায় অতিশয়োক্তি থাকলেও অসত্য ছিলনা। মানুষটার দোষ বাদ দিলে যে সব গুণ ছিল সেগুলিও যেন সহ্য হতোনা

অনেকের। অনেকেই যেন ঈর্ষা পোষণ করত তার সম্পর্কে। হয়ত একটু বুদ্ধি করে চললে তার জন্য গুরুতর কোন ক্ষতি হোত না।

কিন্তু সুস্মিতাদির সব কিছুই ছিল সাধারণের তুলনায় অন্য রকম। তার দোষগুণ সবই ছিল চড়ামাত্রায় ওঠানো। স্বাভাবিকতার সীমা অনেক সময়েই বজায় থাকত না। কতবার তার জন্য সুস্মিতাদিকে তো বটেই তাদেরও তার সঙ্গে নাজেহাল হতে হয়েছে। সব ঘটনা মনে নেই। কিন্তু কয়েকটি ঘটনার স্মৃতি এখনও অস্বস্তিকর।

কোলকাতায় একবার বাসে করে যাচ্ছিল সে সুস্মিতাদির সঙ্গে। দুর্গাপুরে বসবাসকারী এক আত্মীয়ের একটি লিখিত বার্তা পেঁাছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল তার ওপর। উত্তর কলকাতার গলিঘুঁজি তার তত পরিচিত নয়। সুস্মিতাদির সঙ্গে স্প্ল্যানেডে যোগাযোগ করেছিল সে সেকারণেই।

একটি ভীড় বাসে উঠেছিল মৃদুলারা। মেয়েদের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল তারা। মৃদুলার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে মাত্রাছাড়া অসভ্যতা করে যাচ্ছিল। তার হাত থেকে আত্মরক্ষার বহু চেষ্টা করেও সফল হচ্ছিল না মৃদুলা। ডাইনে বাঁয়ে, এপাশে ওপাশে সোজা হয়ে, বেঁকেচুরে ছেলেটির অশ্লীল স্পর্শ থেকে নিজের শরীরকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিল সে। মুখেও দু' একবার সরে দাঁড়াতে বলেছিল। কিন্তু বেপরোয়া ছেলেটি নাছোড়বান্দার মত তার পিছনে পড়েছিল। তার যেন একরকম রোখ চেপে গিয়েছিল সে ব্যাপারে।

সুস্মিতাদি প্রথমে খেয়াল করেননি। একটু পরে মৃদুলার অস্বস্তি লক্ষ্য করে পিছনে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন।

কড়া গলায় ছেলেটিকে ধমক দিলেন তিনি।

—হচ্ছে কি? সরে দাঁড়াও। দেখছ না ও দাঁড়াতে পারছেনা?

ইচ্ছা করেই 'তুমি তুমি' করে কথা বলছিলেন তিনি। অবশ্য 'তুমি তুমি' কেন, অনেক সময় রেগে গেলে তাকে 'তুই তোকারি' করে কথা বলতেও দেখেছে মৃদুলা।

ছেলেটি নির্বিকারভাবে শুনে গেল। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে। কার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হচ্ছে তাও যেন বুঝতে অক্ষম সে। তার আচরণ অপরিবর্তিত রইল।

মৃদুলাকে ক্রমাগত ছটফট করতে দেখে সুস্মিতাদি আর নিজেকে ঠিক

রাখতে পারলেননা। মৃদুলা কিছু বোঝবার আগেই পেছন ফিরে এক চড় কষালেন ছেলেটির গালে। মুহূর্তকাল হতভম্ব হয়ে ছেলেটি পরক্ষণেই হাত তুলল পাল্টা চড় কষানোর জন্য। ওপাশ থেকে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক ব্যাপারটা অনুমান করেই খপ্ করে ধরে ফেললেন তার হাত।

—হচ্ছেটা কি? অ্যাঁ? মেয়েদের গায়ে হাত?

ছেলেটি কিছু বলার আগেই সুস্মিতাদির দিকে ফিরে তাকেও এক ধমক লাগান তিনি।

—আপনারা সব জেনে বুঝেও কেন এরকম কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনের মত আচরণ করেন বলুন তো? এখন কি আর আগেকার যুগ আছে? মেয়ে বলে কি আপনাকে রেয়াত করবে ছেলেরা?

সুস্মিতাদি লজ্জা পেয়েছিলেন। অপমানে লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল উগ্র। তবুও জবাব দিতে ছাড়েননি।

সমান তেজ দেখিয়ে ভদ্রলোকের কথার প্রতিবাদ করেছিলেন।

—তাবলে অসভ্য ছেলেরা যা খুশি তাই করবে আর মুখ বুঁজে সহ্য করে যেতে হবে আমাদের?

ছেলেটি তখন অদ্ভুত আচরণ করেছিল। সুস্মিতাদিকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাস থেকে নেমে গিয়েছিল। যাবার সময় হিসহিস করে বলেছিল অশালীন কয়েকটি কথা।

—শালী কুত্তি কাঁহাকা।

মৃদুলা বুঝেছিল ইচ্ছা করেই গায়ের ঝাল মিটাবার জন্য সুস্মিতাদিকে ধাক্কা মেরেছে ছেলেটি। তবু তার রাগ হচ্ছিল সুস্মিতাদির ওপর। ছেলেটির অমার্জিত গালাগাল শুনে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল তার। মনে হচ্ছিল বাস শুদ্ধ লোক তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছিল মনে মনে তারা মজা পাচ্ছে তাদের অবস্থা দেখে। সুস্মিতাদি তার অবিমৃষ্যকারিতার যোগ্য প্রতিফল পেয়েছেন বলে মনে করছে তারা। কেউ তাদের পক্ষে নেই।

তার জন্যই সুস্মিতাদি বীরাঙ্গনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবু মৃদলা তাকে মনে মনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল, বড় বাড়াবাড়ি করেন সুস্মিতাদি। কখনই

যেন মাত্রা বজায় রেখে চলতে পারেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনদিন সে একা সুস্মিতাদির সঙ্গে আসবে না।

সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তবে মৃদুলা তারপর থেকে অনেক সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি গোলমেলে হয়ে উঠতে দেখলেই সুস্মিতাদিকে যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

ঘটনা অবশ্য আরও অনেক ঘটেছে। একবার দুর্গাপুর থেকে কলকাতা আসার পথে ট্রেনে তাদের আসনের উল্টো দিকে উঠেছিল এক দঙ্গল অবাঙ্গালী ছেলে। খুব বাড়াবাড়ি করছিল তারা। হাসাহাসি, ইয়ার্কি আর ঠাট্টার সঙ্গে অন্যভাবেও জ্বালাতন করছিল। মাঝে মাঝে পা ছড়িয়ে বসে গায়ে পা ঠেকাচ্ছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দিচ্ছিল। সুস্মিতাদির সঙ্গে মৃদুলা নিজেও তার প্রতিবাদ করেছিল। সংখ্যাধিক্যের জোরেই ছেলেগুলো কোন কিছু গ্রাহ্য করছিল না।

সুস্মিতাদি তখন তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে গালাগালি দিচ্ছিলেন।

—সাহস বলিহারি! নিজেদের দেশে আমাদের চোরের মত ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে! ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে এ জিনিষ ঘটতে পারে? আমি তো কম জায়গা ঘুরিনি। সবখানেই দেখেছি চরম প্রাদেশিকতা। ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছে তার জন্য। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও সাহস পাইনি। আর আমাদের এখানে হচ্ছেটা কি? যখন তখন আমাদের উপরেই এক হাত নিচ্ছে। মুখ বুঁজে সহ্য করতে হচ্ছে তা আমাদের। জুতো মারতে হয় এদের।

মৃদুলা পছন্দ করছিলনা এসব কথা। কিন্তু বাধা দিতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে প্রতিবাদও করে উঠতে পারছিলনা। ছেলেগুলো বাংলা কথা কতটুকু বুঝেছিল সে জানেনা। কিন্তু জুতো মারার কথাটা যে তারা ভালভাবেই বুঝেছিল তা বোঝা গেল পরে। ছেলেগুলো তাদের দুটো স্টেশন আগে নেমে পড়েছিল। নামবার আগে তারা প্রত্যেকে সুস্মিতাদির কাছে এসে ঈশারায় জুতো মারার ভঙ্গী করে তবে নেমে গিয়েছিল।

কামরায় অন্য দু'চারজন ভদ্রলোকও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু কেউই তখন প্রতিবাদ করেননি ভয়ে। ছেলেগুলি নেমে যাওয়ার পর তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সুস্মিতাদি কিন্তু তাদের আমল

দেন নি। তাদের সহানুভূতি অগ্রাহ্য করে মৃদুলাকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটি কথা বলেছিলেন।

—কাপুরুষতার চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। মানুষ আর মানুষ থাকে না। অমানুষ হয়ে যায়।

সুস্মিতাদির মুখে ওরকম শক্ত কথা শুনে নতুন করে ভয় পেয়ে গিয়েছিল মৃদুলা। আবার কোন বিপত্তিতে জড়িয়ে পড়তে হবে ভেবে ভয়ে শিউরে উঠেছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঘটনার জের সেদিন আর বেশিদূর গড়ায়নি। তবে পরেও মাঝে মাঝে কম বেশি ওরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে সুস্মিতাদির কারণে।

মৃদুলা নিজে বরাবরই নির্বিরোধী। ঝুটঝামেলা পাকাতে তার চরম আপত্তি। অনেক সময় অন্যায় হচ্ছে বুঝেও সে প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। সুস্মিতাদির মধ্যে সৎসাহসের প্রাচুর্য দেখে তার মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হোত। তবু সুস্মিতাদির স্বভাবে মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অনেক সৎগুণই শেষ পর্যন্ত ঘোর অশান্তি ও কলহের কারণ হয়ে উঠত। মৃদুলাও শেষ পর্যন্ত অবিমিশ্র মনোভাব বজায় রাখতে পারত না।

শুয়ে শুয়ে অতীতের স্মৃতিচারণা করতে করতে তীব্র বিষাদে ভরে যাচ্ছিল মৃদুলার মন। সুস্মিতাদির সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে তার জীবনের নানা অধ্যায় ও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সে। একটা মানুষের জটিল মনোজগতের অনেক নিভৃত চিন্তাভাবনা তার চোখের সামনে হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। মানুষটাকে অনেকখানি চিনে ফেলেছে সে। সেই জন্যই তার স্বভাবের অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার প্রতি এক ধরনের মমত্ব ও সহানুভূতিবোধ গড়ে উঠেছে।

সুস্মিতাদির রৌদ্রদগ্ধ শরীর ও মনের কষ্ট তার মনটাকেও খাক করে দিয়েছিল। তবু যেন পুরোপুরিভাবে সেই কষ্টের ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিল না। বিশেষ করে শেষের দিকে উন্মাদিনীপ্রায় সুস্মিতাদি স্বামীর বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদ্গার করতেন, যেভাবে অনবরত তার মৃত্যু কামনা করতেন তার দরুন তার মনের অতলে থিতিয়ে থাকা ভালবাসার তলানি টের পাওয়া যেত না।

স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পরও যে একটি মানুষ

অতীতের অধ্যায় ভুলে আবার সেই স্বামীরই সঙ্গে নতুন করে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখতে পারে তা তার ধারণার অতীত ছিল।

বিছানাটা শরশয্যার মত লাগছিল মৃদুলার। বিগত কয়েক বছরের স্মৃতির টানাপোড়েনে অস্থির উত্তাল বোধ করছিল সে। দীপঙ্করের একটা হাত তার গায়ে এসে পড়ে। আস্তে করে হাতটা সরিয়ে দেয় মৃদুলা। রক্ষা যে দীপঙ্কর ঘুমিয়ে পড়েছে। নাহলে সে বিরক্ত হতো।

সুস্মিতাদির সম্পর্কে খুবই বিরূপ সে। তাকে নিয়ে মৃদুলার 'মাথাব্যথা' যে তার আদৌ পছন্দ নয় তা সে মাঝে মাঝেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পিনাকীদার মৃত্যুসংবাদে সে ব্যথিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সুস্মিতাদির কষ্টের কথা বিশ্বাস করেনি। রূঢ়ভাবে বলেছিল, ঐ মহিলার জন্য তার মনে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নেই। ওর ঐ কষ্ট লোক দেখানো কষ্ট।

সুস্মিতাদি সত্যিই দুর্ভাগা। মাত্রাজ্ঞানের অভাবে তার সমস্ত সৎগুণই শেষ পর্যন্ত এক কড়াই দুধে গোমূত্র পড়ার সামিল হয়েছে। মৃদুলার মনে হোল দীপঙ্করকে দোষ দিয়ে কি হবে? পিনাকীদাই কি সুস্মিতাদিকে চিনতে পেরেছিলেন? আকৈশোর ঐ মানুষটার সান্নিধ্য পেয়েছেন যে মানুষ, তার হৃদয়বত্তা ও মমতার হাজারটা নিদর্শন দেখেছেন যে মানুষ, তিনিও কি ভুল করেননি সুস্মিতাদিকে বুঝতে?

চার

সমস্ত রাতটা আধো তন্দ্রা আধো জাগরণের মধ্যে কাটল মৃদুলার। মাঝে মাঝে এলোমেলো স্বপ্নও দেখল সে। তার মধ্যে সুস্মিতাদি আর পিনাকীদাও বাদ গেলেননা। ভোরের দিকে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙ্গল তার। অবশ্য নিজের থেকে নয়। দীপঙ্করই ডেকে ডেকে তার ঘুম ভাঙ্গাল।

আড়মোড়া ভেঙ্গে লজ্জিত সুরে কৈফিয়ত দেয় সে।

—ইস্ এত বেলা হয়ে গেছে! সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। খালি সুস্মিতাদি আর পিনাকীদার কথা ভেবেছি। সত্যি সুস্মিতাদি যে

পিনাকীদাকে এখনও এত ভালবাসেন তা বুঝিনি। এত ভালবাসা সচরাচর দেখা যায়না। তবু কি কপাল দেখ! সংসারটা ভেঙ্গে গেল। আর জোড়া লাগলনা।

রূঢ়ভাবে বাধা দিল দীপঙ্কর।

—সাত সকালে আবার তুমি সুস্মিতাদির কথা সাতকাহন করে শোনাতে এসেছ? বলেছি তো ঐ মহিলার প্রতি আমার এতটুকুও সহানুভূতি নেই। তোমার মত সব কথা অত সহজে ভুলে যাইনা আমি। বেঁচে থাকতে কম জ্বালিয়েছেন উনি স্বামীকে? তোমার কাছেই শুনেছি কলকাতায় গিয়ে এর তার কাছে স্বামীর নামে যা-তা বলেছেন। ভুবনেশ্বরীর বাড়িতে যখন তখন ফোন করে উল্টোপাল্টা কথা শুনিয়েছেন। পিনাকীদার পরিচিত মহলে উড়ো চিঠি পাঠিয়ে ওঁর নামে যাচ্ছেতাই সব অপবাদ দিয়েছেন। যে মহিলা এতসব কাণ্ড করেছেন তার তো স্বামীর মৃত্যুতে এতটা অধীর হয়ে পড়ার কথা নয়?

মৃদুলা বিরক্ত হয়।

—তুমি সত্যিই হৃদয়হীন। শুনছ সুস্মিতাদি কষ্ট পাচ্ছেন। তবু যা তা বলে চলেছ সমানে। পিনাকীদা মারা গেছেন। ওর সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে চাইনা। কিন্তু উনি কি কম কষ্ট দিয়েছেন সুস্মিতাদিকে? সুস্মিতাদি ঐ স্বামীর জন্য কম ত্যাগ স্বীকার করেছেন? বাড়ির পছন্দমত বিয়ে করলে আজ সমাজের অনেক ওপর-তলায় থাকতে পারতেন। কিন্তু ভালবাসার জন্য সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে গ্রহণ করেছেন পিনাকীদাকে। পিনাকীদা স্বার্থপরের মত শুধু নিয়েই গেছেন। প্রতিদানে যে কিছু দিতে হয় সেকথা মনে রাখেননি।

দীপঙ্কর আবার বাধা দেয় রূঢ়ভাবে।

—দেখ কৃতজ্ঞতাবোধ দিয়ে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা যায়না। সুস্মিতাদির মত মহিলার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা বাইরের লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। ওঁর স্বামীর পক্ষে তা কি করে সম্ভব? আমি তো কোন দোষ দেখিনা পিনাকীদার। আমার মতে সুস্মিতাদির ট্র্যাজেডি ওর নিজের তৈরি। ওর ব্যবহারে বা আচরণে অতিষ্ঠ হয়েই পিনাকীদা অন্য মেয়ের কাছে আশ্রয় খুঁজেছেন।

প্রতিবাদ নিরর্থক হবে ভেবে মৃদুলা চুপ করে থাকে। প্রথম থেকেই দীপঙ্কর সুস্মিতাদিকে অপছন্দ করতে সুরু করেছে। পরে তা ঘনীভূত

হয়েছে। মৃদুলা নিজেও তার ইন্ধন জুগিয়েছে বৈকি! স্কুলের নানা ঘটনা দীপঙ্করের কাছে ফলাও করে বলেছে। উত্তেজনার মুহূর্তে সুস্মিতাদির ভাবমূর্তি বজায় রাখার কথা একবারও ভাবেনি। তার সেই অসতর্কতার দায় তো তাকে বইতেই হবে।

তবু যখনই তার মনে হয় কিভাবে সুস্মিতাদি দীপঙ্করের হয়ে তার কাছে ওকালতি করেছেন এবং সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তাকে নির্বাচিত করতে উৎসাহিত করেছেন তখনই তার দুঃখ হয়। সেই সঙ্গে রাগ। সব জেনে শুনেও দীপঙ্কর তার ধারণা থেকে একচুলও নড়বেনা।

দীপঙ্কর যতক্ষণ বাড়িতে রইল মৃদুলা সুস্মিতাদি বা পিনাকীদার সম্পর্কে আর একটিও কথা উচ্চারণ করলনা। সারাক্ষণই একটা আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে কাজ করতে থাকে তার মন। বহু দিনের বহু ঘটনা, বহু সংলাপের ভাষা আনাগোনা করে তার স্মৃতিতে। প্রাতরাশ সেরে দীপঙ্কর বেড়িয়ে যাওয়ার পর আবার মৃদুলা ডুব দেয় অতীতের স্মৃতিচারণে।

দুর্গাপুরে সে যখন চাকরি নিয়ে আসে তখন সুস্মিতাদি অবিবাহিতা। পিনাকীদা কিন্তু মাঝে মাঝেই এসে থাকতেন দুর্গাপুরে। সুস্মিতাদির কোয়ার্টার্সেই থাকতেন তখন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও সেটি অনুমান করা শক্ত হতোনা। একটা ছকে বাঁধা থাকত সুস্মিতাদির আচরণ ও কার্যকলাপ।

মৃদুলাদের কাছে আনন্দের মুহূর্তে ঘোষণা করে ফেলতেন উনি পিনাকীদার আগমনের কথা। পরে অসুস্থতার ওজুহাতে স্কুলে আসা বন্ধ করতেন কয়েকটা দিন। খুব জরুরী প্রয়োজনে সেই সময় কেউ তার কোয়ার্টার্সে গেলে দরজা খুলে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কথা কইতেন। তাকে ভেতরে আসতে বলতেননা। নাছোড়বান্দাদের তিনি বড়জোর সামনের ঘরে বসিয়ে কথা সারতে চাইতেন। বলাবহুল্য পিনাকীদা কখনই সামনে থাকতেন না। কিন্তু প্রতিবেশিরা টের পেয়ে যেত তার উপস্থিতি।

আর একটি নিয়ম অনুসরণ করে চলতেন তিনি। কাজের লোকটিকে ছুটি দিয়ে দিতেন সেই ক' দিন। কিন্তু চাপা থাকতনা আসল রহস্য। ঠিকে কাজের লোক অনেক সময়েই কাছেপিঠে একাধিক বাড়িতে কাজ

করে। হয়ত তাদের চোখে পড়ত কোন কিছু। কাজের বাড়িতে সে ব্যাপারে তারা মুখটি খুলবেনা এমন হতে পারে না।

তাছাড়া সব সময়েই আসার সময় পূর্বনির্দিষ্ট থাকতনা। অনেক সময় পিনাকীদা দুর্গাপুরে সুস্মিতাদির কোয়ার্টার্সে এসে উপস্থিত হবার পরও কাজের লোককে ছুটি দিয়ে দিতেন। নিয়মিত ব্যবধানে এধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে সাধারণের পক্ষে অন্য রকম অনুমান করা অস্বাভাবিক নয়। বুদ্ধিমতী সুস্মিতাদি বুদ্ধি খাটিয়েও লোকের মুখ চাপা দিতে পারেননি। স্কুলে শিক্ষিকাদের মধ্যেও আলোচনা চলত তা নিয়ে। মৃদুলারা প্রতিবাদ জানাতে ভরসা পেত না। সমস্ত ঘটনার পূর্বাপর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটার মুখরক্ষামত চেহারা খাড়া করা সম্ভব হোতনা।

প্রথম দিকে এসব ব্যাপার জানা ছিলনা মৃদুলার। তখন একবার সে ওরকম সময় সুস্মিতাদির কোয়ার্টার্সে গিয়েছিল। ওর সঙ্গেও সুস্মিতাদি দায়রক্ষামত সংক্ষেপিত ভদ্রতা করেছিলেন। ভেতরে আসতে বলেন নি। মৃদুলার কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক ঠেকেনি বলেই ও অনসূয়াদির কাছে ওর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। অনসূয়াদি এড়িয়ে গিয়েছিলেন তখন।

পরে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর সব কিছু জানতে পেরেছিল মৃদুলা। সহ-কর্মীদের আলাপ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কালক্রমে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনসূয়াদি ও সুস্মিতাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রেও সুস্মিতাদির জীবনেতিহাসের অনেক জটিল জট একটু একটু করে খুলে গিয়েছে। অনেক দুর্বোধ্য আচরণ বোধগম্য হয়ে উঠেছে।

পরের দিকে পিনাকীদার দুর্গাপুরে আগমনের খবর পেলে মৃদুলা আর সুস্মিতাদির কোয়ার্টার্সে যেতনা। যথারীতি সুস্মিতাদি স্কুলে অনুপস্থিত থাকতেন। অনন্যপায় হয়ে কখন সখন স্কুলে হয়ত আসতেন। কিন্তু চেষ্টাচরিত্র করে প্রিন্সিপালের অনুমতি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যেতেন।

সহকর্মীরা অনেকেই অনেক রকম বাঁকা কথা বলত। কিন্তু প্রিন্সিপাল ভদ্রমহিলার আশ্চর্য এক দুর্বলতা ছিল সুস্মিতাদির ওপরে। খুব বেশিরকম গুণমুগ্ধ ছিলেন যেন তিনি। নানা উপলক্ষে নানা ঘটনার মধ্যে তার সেই গুণমুগ্ধতা প্রকাশ পেত। যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে

সুস্মিতাদির মুখ্য ভূমিকা থাকবেই। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সুস্মিতাদির অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেও দ্বিধা ছিলনা তার।

মাঝে মাঝে কামাই করতেন সুস্মিতাদি। নিয়ম মাফিক অন্য শিক্ষিকাদের তার ক্লাস নিতে হোত। স্বাভাবিক কারণেই অসন্তুষ্ট হোত তারা। তাদের অসন্তোষ সব সময় চাপা থাকতনা। প্রিন্সিপাল ভদ্রমহিলা কিন্তু সেই ব্যাপারকে তেমন আমল দিতেন না। তার মনোভাবই সুস্মিতাদির পক্ষে রক্ষাকবচ ছিল।

অপর পক্ষে সুস্মিতাদির খামখেয়ালী আচরণেও মদত দিয়েছিল তা। মৃদুলার ধারণা পিনাকীদার দুর্গাপুরে আসা যাওয়া সেই কারণেই অব্যাহত ছিল। অনেকেই তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করত। মৃদুলা তাতে যোগদান করতনা ঠিকই। তবে তার মনেও ঐ ব্যাপারে একটা খটকা কাজ করত। রুচিগর্হিত হবে ভেবে অনসূয়াদির সঙ্গেও তা নিয়ে আলোচনা করেনি সে। অনেক পরে কথাপ্রসঙ্গে স্বয়ং সুস্মিতাদিই তার ওপরে আলোকপাত করেন।

পিনাকীদার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হওয়ার সময় কোন এক দুর্বল মুহূর্তে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অনেক কিছু অকপটে ব্যক্ত করে ফেলেন তিনি। বিয়ের কয়েক বছর পর পিনকীদার প্রেমে যখন ভাটা চলেছে, ভুবনেশ্বরীর জন্য তাদের সম্পর্ক ত্রিভুজের চেহারা নিচ্ছে তখন এক প্রায়ান্ধকার বিকেলে মৃদলার কাছে তাদের যৌথ জীবনের অনেক জটিল ঘটনাসংকুল অতীতের ছবি আলো ফেলে ফেলে মেলে ধরছিলেন। নিঃসঙ্গতার দুঃখে কষ্ট পাচ্ছিলেন তখন তিনি। মাসের পর মাস টালবাহানা করে দুর্গাপুরে আসছেননা পিনাকীদা। চিঠির পর চিঠি লিখেও লাভ হচ্ছেনা। শেষে তার করে সংক্ষিপ্ত জবাব পেলেন, 'খুব ব্যস্ত। এখন আসতে পারছিনা।'

ঘটনার গতি ততদিনে অনেক দূর গড়িয়েছিল। ভুবনেশ্বরীকে জড়িয়ে পিনাকীদার সম্বন্ধে অনেক উল্টোপাল্টা কথা শোনা যাচ্ছিল লোকমুখে। সঙ্গীতাকাশে সে তখন নবাগতা তারকা। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার চূড়ায় পেঁছবার জন্য ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। তার কণ্ঠের অনুপম লাবণ্য ও মাধুর্য শ্রোতাদের ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করছে। জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সে।

কিন্তু তাকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে এসেছেন পিনাকীদাই। রেডিও

অফিসে নিজের প্রতিষ্ঠাকে কাজে লাগিয়ে ভুবনেশ্বরীর জন্য খ্যাতিস্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছেন তিনি। ভুবনেশ্বরী অনুপম কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী না হলে হয়ত সেই আরোহণ এত অনায়াস ও মসৃণ হোত না। তবু বাস্তবে কত প্রতিভা, কত গুণই তো লোকচক্ষের অন্তরালে থেকে যায়। তাকে ঘষেমেজে জনতার কাছে তুলে ধরার সুযোগ কত জনেরই তো থাকেনা।

ভুবনেশ্বরীর ক্ষেত্রেও হয়ত তার ব্যতিক্রম ঘটতনা যদি না তার জীবনে পিনাকীদার আবির্ভাব ঘটত। এক মাহেন্দ্রক্ষণে পিনাকীদার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তার। ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠলাবণ্যে মুগ্ধ পিনাকীদা সেই যাদুমায়ায় সকলকে আবিষ্ট করে দিতে চাইলেন। ভুবনেশ্বরীর জন্য উপযুক্ত সঙ্গীত শিক্ষক জোগাড় করে দেওয়া থেকে সুরু করে তার প্রাত্যহিক রেওয়াজ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া, তার খুঁটিনাটি প্রয়োজনের তদারকি করা, তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনযাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রয়োগ করতে থাকলেন। ভুবনেশ্বরীর বাবা মা মেয়ের সাফল্যের জন্য পিনাকীদার অভিভাবকত্ব মেনে নিলেন। বিশেষতঃ ভুবনেশ্বরীর মা সাগ্রহে বরণ করে নিলেন পিনাকীদাকে।

ক্রমশঃ ঘটনার গতি অন্য দিকে মোড় নেয়। ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে পিনাকীদার সম্পর্ক লোকচক্ষে আর নির্দোষ ছিলনা। ঘনিষ্ঠতার সেই চরম পর্যায়ে পিনাকীদা ভুলে গেলেন যেন সুস্মিতাদিকে। প্রথম প্রথম নিয়মরক্ষামত মাসে একবার করে দুর্গাপুরে আসতেন। পরের দিকে সেটুকুও রক্ষা করতে পারলেননা। ছুটিছাটার সময়েও ভুবনেশ্বরীর পরিবারের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেতেন। সুস্মিতাদি দুঃখে কষ্টে, লজ্জায় অপমানে খানখান হয়ে যাচ্ছিলেন।

সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। জটিল উচ্চাবচ সেই ইতিহাসের সাক্ষী মৃদুলারা। সেই সময় দুঃখের মুহূর্তে মৃদুলার কাছে ভেঙ্গে পড়েছিলেন সুস্মিতাদি। অবিশ্বাস্য এক স্বীকারোক্তি করেছিলেন তিনি তার কাছে। সুস্মিতাদি সেদিন নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছিলেন। অকপটে তিনি বলতে পেরেছিলেন—'বিয়ের আগে প্রেমিককে শরীর দেওয়া ঠিক নয়।' তার বক্তব্য ছিল বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে প্রেমিকের কাছেও সস্তা হয়ে যায় প্রেমিকা। বিয়ের পরও

বিবাহপূর্ব সেই ব্যাপারটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরাতে পারে। যে কোন উপলক্ষেই তা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

ইচ্ছা করেই মৃদুলা সেদিন ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন তোলেনি। তবু সুস্মিতাদি জলের তোড়ের মত বাধাবন্ধহীন আবেগ ও উত্তেজনায় ব্যক্ত করেছিলেন অতীতের এক বিশেষ অধ্যায়।

পিনাকীদা তখন নকশাল রাজনীতিতে বিশ্বাসী। কয়েক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে তিনিও নকশালদের কয়েকটি কীর্তির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। পুলিশ তার বন্ধুদের প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করে। সুস্মিতাদি পিনাকীদাকে নিজের কোয়ার্টার্সে রেখে দিয়েছিলেন। পিনাকীদার অনুরোধে তার সঙ্গে রাত্রিবাসেও সম্মত হয়েছিলেন। অনেক ঝুঁকি নিয়েছিলেন তার জন্য।

তবে তার মনে তার জন্য কোন অনুশোচনা ছিলনা। পিনাকীদাকে প্রথম দর্শনের মুহূর্ত থেকেই একান্ত আপনার জন বলে ভেবেছেন। দুশ্চিন্তা যেটুকু ছিল তা তার ফলাফল নিয়ে। লোকচক্ষে তাকে বৈধ রূপ দেওয়া নিয়ে।

তার কারণ ছিল। সুস্মিতাদির বাবা তখনও জীবিত। তিনি কিছুতেই পিনাকীদাকে সুস্মিতাদির স্বামী রূপ মেনে নেবেননা। আর বাবার অতি আদরের ছোট মেয়েটিও বাবা বর্তমানে তার অমতে তাকে বিয়ে করতে চাননি।

কয়েকটা দিন দুর্গাপুরে পিনাকীদাকে রেখে দিয়েছিলেন সুস্মিতাদি। কিন্তু সকলের মাঝখানে কতদিন আর লুকিয়ে রাখা যায় বয়স্ক একজন পুরুষ মানুষকে? তাছাড়া সেই মানুষটার কাছেও নিরাপদ আশ্রয় তখন আর সুখকর ছিলনা। ঘরের দেওয়াল হয়ে উঠেছিল জেলখানার নিশ্ছিদ্র দেওয়ালের মত। অতএব সুস্মিতাদি দীর্ঘ দুই মাসের ছুটি নিয়ে পিনাকীদার সঙ্গে বেড়াতে চলে গেলেন রাজস্থানে। বলাবাহুল্য সমস্ত খরচ বহন করলেন নিজে।

পিনাকীদার জন্য আগেও তিনি কম ব্যয় করেননি। প্রয়োজনে নকশালদের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ও সেই সঙ্গে পুলিশের নজর এড়িয়ে লুকিয়ে রাখার জন্য জলের তোড়ের মত অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হলেন। চেনাপরিচিত লোকেদের কাছে ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন থাকতে পারেনা। আড়ালে ইঙ্গিতে অনেক কিছু তারা আঁচ

করতে পারল। বাড়িতেও ঠারে ঠোরে কম কথা শুনলেননা। সব কিছু অগ্রাহ্য করলেন সুস্মিতাদি।

বাবার কানেও সেসব কথা গেল বৈকি! কিন্তু নিজের মান বাঁচাবার জন্যই হোক কিংবা অন্য কোন গূঢ় কারণেই হোক অন্যদের মত সেসব কথা তুলে খুঁচিয়ে ঘা করতে চাইলেননা।

রাজস্থানে স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে দু'মাস কাটিয়ে যখন তারা কলকাতায় ফিরে এলেন তখন পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ধরপাকড়ের পালাটা অনেক কমেছে। নকশাল বন্ধুরা সকলেই জেলে। তাদের পক্ষে পিনাকীদার কোন ক্ষতি করা সম্ভব না। ধরপাকড়ের সময় দূরে থাকায় পুলিশের নজর এড়িয়ে গেলেন পিনাকীদা। সুস্মিতাদি অবশ্য তার বাপের বাড়ির পরিচিত প্রভাবশালী দু' একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গেও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে পিনাকীদার গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা নির্মূল করেন।

ইতিমধ্যে পিনাকীদারও মোহভঙ্গ হয়েছে। বিপদের মুখোমুখি হয়েই হোক, বন্ধুদের সংশ্রবচ্যুত হয়েই হোক, কিংবা সুস্মিতাদির প্রভাবেই হোক নকশাল রাজনীতির মোহ কেটে গেছে তার। পরবর্তী ইতিহাস অনেক মসৃণ। রেডিও অফিসে ভাল চাকরি, চাকরিতে ধাপে ধাপে উন্নতি, নাম, খ্যাতি পিনাকীদাকে অনেক ওপরে উঠিয়ে দিল।

ফরাসীরা নাকি যেকোন অপরাধের পিছনে কোন মহিলাকে খোঁজে। তারা বলে 'শেরশে লা ফাম'। পুরুষপ্রভাবিত সমাজব্যবস্থায় পুরুষের নাম, যশ, খ্যাতির পিছনে সেই পুরুষের আপনজন কোন মহিলার অবদান কিন্তু সেভাবে বিবেচ্য বলে গণ্য হয়না। অথচ পৃথিবীতে নামী দামী মানুষের জীবনে এরকম অজস্র উদাহরণ রয়েছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছে এই সব মহিলার কোমল হৃদয়বৃত্তি। সাহিত্যে সঙ্গীতে প্রতিভার অধিকারিণী হয়েও তারা স্বামী বা প্রেমিকের জন্য দাসীবৃত্তি অবলম্বনেও দ্বিধা করেননি। জনৈক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের ঘরণী সম্পর্কে অপর [illegible] প্রখ্যাত সাহিত্যিক সক্ষোভ মন্তব্য করেছিলেন যে স্বামীকে তোলবার জন্য ঐ মহিলা যতখানি শক্তিব্যয় করেছিলেন তার কণামাত্রও যদি নিজের লেখার জন্য ব্যয় করতেন তাহলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যরকম কাহিনী লেখা হোত। ঐ মহিলার লেখা কয়েকটি গল্প নাকি তার অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। নিরন্তর সাধনা ও প্রয়াসেই সহজাত

প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। ঐ মহিলার প্রতিভার অংকুর অচিরেই শুকিয়ে যায়। স্বামী ও সংসারের প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণে নিঃশেষিত হয়ে যায় তার শক্তি। সাহিত্যসাধনার তাগিদ বা সময় কোনটাই আর অবশিষ্ট থাকেনা। সেই আত্মত্যাগের কোন স্বীকৃতি পর্যন্ত মেলেনা তার।

অপর পক্ষে একজন প্রখ্যাতা সাহিত্যিক নিজেই মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি যতদিন সর্বতোভাবে তার প্রতিভাবান সাহিত্যিক স্বামীর দাসীবৃত্তি করেছেন ততদিন তাদের দাম্পত্যজীবনে কোন চিঁড় ধরেনি। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি তার শিল্পী সত্তার অপ্রতিরোধ্য তাগিদে আত্মপ্রকাশের পন্থা অনুসরণ করেছেন সেদিন থেকে সুরু হয়েছে তাদের বিরোধ। শিল্পী স্বামী সহ্য করতে পারেননি শিল্পী স্ত্রীর শিল্প-সাধনা। সংসারবৃত্তির পক্ষে তাকে অন্তরায় বলে গণ্য করেছেন। স্বামী [illegible] আঘাত ঘটবে ভেবে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়। [illegible] প্রতিভা ও যোগ্যতা তার কাছে ঈর্ষারও কারণ হয়ে উঠেছে।

[illegible]তিক্রমের ঘটনাও জানা আছে মৃদুলার। অপর এক খ্যাতিমান মহিলা সাহিত্যিক তার স্বামীর সহযোগিতার কথা অকুণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। তবে মৃদুলার ধারণা তিনি স্বয়ং সাহিত্যিক ছিলেননা বলেই রক্ষা। নইলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াত বলা মুশকিল।

সুস্মিতাদির সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে মাঝে মাঝেই এসব কথা মনে হয় মৃদুলার। প্রেমের জন্য অতখানি আত্মত্যাগ কি করে সম্ভব ভেবে পায়না সে। নিজেও তো প্রেম করে বিয়ে করেছে! কিন্তু সুস্মিতাদির মত নিজের সব কিছু দীপঙ্করের জন্য বিসর্জনে কি প্রস্তুত সে? তার নিজস্ব জীবনযাত্রার ছক বিয়ের পরও মোটামুটি অক্ষতই আছে।

সুস্মিতাদির কথা চিন্তা করলে তাই তার বিস্ময়ের থই থাকেনা। বৈষ্ণব কবিতার শ্রীরাধাও বুঝি ম্লান হয়ে যায় সুস্মিতাদির কাছে। সুস্মিতাদির সমস্ত জীবনচর্যার কেন্দ্রবিন্দুটি যেন প্রেম। তার সুখ শান্তি আশা আনন্দ বিষাদ যন্ত্রণা হতাশা অস্থিরতা অস্বাভাবিকতা সব আবর্তিত হচ্ছে প্রেমকে কেন্দ্র করে। সুস্মিতাদি নিজেও কি তা উপলব্ধি করেননা? তবু তার নাগপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেননা কিছুতেই।

পিনাকীদা যে তার ফায়দা লুটছেন ক্রমাগত তা বুঝেও শক্ত হতে পারেননি। অথচ বিয়ের অনেক আগে থেকেই তো তাকে শোষণ করে

আসছেন পিনাকীদা। অর্থ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, অনুপ্রেরণা দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে দিনে দিনে তৈরি করে তুলেছেন তিনি পিনাকীদাকে। অপর পক্ষে পিনাকীদা সেই দুর্বলতার ফায়দা তুলেছেন ক্রমাগত চাপ দিয়ে।

শুধু সুস্মিতাদি কেন, অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে থেকেও একটু একটু করে যে তথ্য সে আহরণ করেছে তাতে পিনাকীদার মনোভাব অনেকখানিই প্রকট হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি মানুষটাকে তার চরম সুবিধাবাদী ও চতুর বলেই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে অল্প বয়সে হয়ত সত্যিই ভেজাল ছিল না তার চরিত্রে। তবে পরবর্তীকালে কৈশোরে প্রেম প্রীতি ও সখ্যের অনুভূতির সঙ্গে যে অনেক কিছুর সংমিশ্রণ ঘটেছে সে বিষয়ে মৃদুলা প্রায় পুরোপুরিই নিঃসন্দেহ।

কিন্তু যে কথাটা সে বুঝতে পা[illegible]তাদির মত উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী একজন মহিলা [illegible] মত আঁকড়ে ধরেছিলেন পিনাকীদাকে? পিনাকীদা[illegible] তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন সুস্মিতাদি তা[illegible] করেছিলেন যে বিয়ের আগে পিনাকীদার ইচ্ছামত তা[illegible] সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে তিনি ঠিক করেননি।

মৃদুলার মনে হয় অনেক আগেই [illegible] করেছেন সুস্মিতাদি স্বয়ং। পিনাকীদার প্রতি তা[illegible] নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেই যত গোল বাঁধিয়েছেন তিনি। [illegible] সীমারেখা, নিজের ত্রুটি কোনদিনই তলিয়ে দেখা[illegible]। না চাইতেই দু'হাত ভরে অজস্র পেয়েছেন।

সুস্মিতাদি অভিমান করে কিংবা রাগ করেও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন চেষ্টা করেননি। অনেক পরে পরিস্থিতি যখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে তখনও স্বামীগতপ্রাণ অশিক্ষিত মহিলার মত উল্টোপাল্টা আচরণ করেছেন। সকলের কাছেই তার হৃদয়দৌর্বল্য বা জ্বালাযন্ত্রণা দ্বিগুণভাবে প্রকটিত হয়েছে। একই সঙ্গে করুণা ও উপহাসের পাত্রী করে তুলেছেন তিনি নিজেকে।

সুস্মিতাদির নিজের বাড়ির লোকজনদের দেখেছে মৃদুলা। বেশে ভূষায়, আচারে আচরণে যথেষ্টই প্রাগ্রসর তারা। কিন্তু সুস্মিতাদির কোন কোন আচরণ পুরোপুরি যেন পরিবারছাড়া। তার তুকতাকে বিশ্বাস ত্যাদির সঙ্গে পারিবারিক ঐতিহ্য যেন খাপ খায়না।

সুস্মিতাদি নিজেই একদিন তার কারণ ব্যক্ত করেছিলেন। কৈশোরে পিনাকীদার পরিবারে যাতায়াতের সূত্রে যে সব ধ্যান ধারণার বীজ তার মনে উপ্ত হয়েছিল তা পরবর্তীকালে বাবার সঙ্গে আসামে কিছুকাল বসবাসকালে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। পিনাকীদার প্রতি মাত্রাহীন হৃদয়দৌর্বল্য তাতে ক্রমাগত জলসিঞ্চন করে চলেছিল। হয়ত ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে দেখা না হলে আদৌ কোন সমস্যা দেখা দিতনা। সংসারে আরও দশজনের মত সুখে দুঃখে নিয়মিত ছন্দে অতিবাহিত হোত তার জীবন।

কিন্তু সুস্মিতাদির স্বভাবের জন্যই হোক কিংবা পিনাকীদার স্বভাব বা জীবনযাপনের ধরনের জন্যই হোক সুস্মিতাদির জীবনের ছক অন্যদের থেকে অনেকটা আলাদা হয়ে গেল। তার চিন্তাভাবনা কিংবা আশা আকাঙ্খার নিয়ন্ত্রণে বাঁধা থাকলনা তার জীবনের গতি। নিয়ন্ত্রণের রাশ যত কড়া করে বাঁধতে গেলেন তত তা আলগা হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

দুর্গাপুরে তার কর্মজীবন সুরু হওয়ার সময় থেকেই সুস্মিতাদির টালমাটাল অবস্থা দেখে আসছে মৃদুলা। বিয়ের আগেই তার সূচনা দেখা গিয়েছিল। সুস্মিতাদি পিনাকীদার সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন যত শক্ত করে বাঁধতে যাচ্ছিলেন পিনাকীদা তত তা ফস্কা গেরো করে তুলছিলেন।

স্বভাবে সুস্মিতাদি মিতব্যয়ী। অকারণে পয়সা ব্যয় করার পক্ষপাতী নন তিনি। কোন কোন ব্যাপারে রীতিমত কার্পণ্যই আছে তার। পিনাকীদা মাঝেমাঝেই টাকা পাঠানোর বায়না পেশ করতেন। রেডিও অফিসের চাকরিতে পাকাপোক্তভাবে বহাল হয়ে যাওয়ার পরও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

অনেক সময় প্রিন্সিপাল কিংবা ঘনিষ্ঠ দু'একজন সহকর্মীর কাছে ধারদেনা করে সুস্মিতাদিকে সে আবদার মিটাতে হয়েছে। পিনাকীদা কোথায় কি ভাবে কেন সে টাকা ব্যয় করবেন তা নিয়ে তার যথেষ্টই দুশ্চিন্তা থাকত। তবু টাকা পাঠাতে অন্যথা করতেননা। মৃদুলার সঙ্গে ভাল রকম ঘনিষ্ঠতার পর একদিন মৃদু আফশোস করেছিলেন তিনি তার কাছে। রসিকতার ভঙ্গীতে বলা হলেও তার অন্তর্নিহিত ক্ষোভটুকু প্রচ্ছন্ন থাকেনি মৃদুলার কাছে।

সুস্মিতাদি বলেছিলেন—'অন্যদের বেলায় যা হয় আমার বেলায় কেন তা অন্যরকম হয় বলতে পারিস? আমাদের সমাজব্যবস্থায় পুরুষই

টাকা দেয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঘটছে ঠিক তার উল্টোটা। আমি কোন দিন ওর কাছে কিছু চাইনি। আমাকেই প্রথম থেকে ওর টাকার চাহিদা মেটাতে হয়েছে।'

পিনাকীদার বিরুদ্ধে সুস্মিতাদির ক্ষোভ আরও অনেক ছিল। নানা উপলক্ষে মাঝে মাঝে তা প্রকট হয়ে পড়েছে। মৃদুলার মনে আছে একবার অনসূয়াদি স্বামীর কাছে পাওয়া একটি দামী সুন্দর শাড়ী পরে এসেছিলেন। মৃদুলা প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিল সেটি অনসূয়াদির স্বামী নিজে পছন্দ করে কিনে এনেছিলেন স্ত্রীর জন্য। অপ্রত্যাশিত-ভাবে সেই উপহার পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অনসূয়াদি। স্বামী বলেছিলেন কোন এক শাড়ীর দোকানের সামনে শাড়ীটি ঝুলতে দেখে তার ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়। স্ত্রীর গায়ের রঙে শাড়ীটির জেল্লা আরও খুলবে বলে মনে হয়েছিল তার। সঙ্গে সঙ্গে এক কথায় বিনা দরদস্তুরে শাড়ীটি কিনে নিয়ে আসেন ভদ্রলোক।

মার্জিত রুচিসম্পন্না অনসূয়াদির মাত্রাবোধ রুচিবোধের ঘাটতি ছিলনা। দাম্পত্য সুখ অপরের কাছে নির্লজ্জভাবে জাহির করার কোন প্রবণতা কোনদিন তার মধ্যে দেখেনি মৃদুলা।

মৃদুলারা শাড়ীর প্রশংসা করতে কথাপ্রসঙ্গে সেই সুখকর সংবাদটুকু দিয়েছিলেন। মৃদুলারা খুব উপভোগ করেছিল সেই তথ্যটুকু। সুস্মিতাদিও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তবু তার মনের বিষাদ চাপা থাকেনি। রসিকতার সুরে যে অভিযোগ করেছিলেন, তার সত্যতা ধরা পড়েছিল তার মুখচোখের ভঙ্গীমায়, কণ্ঠস্বরের মৃদু বিষাদমিশ্রিত গাম্ভীর্যে।

অল্প হেসে বন্ধুকে বলেছিলেন—'তোর ভাগ্য সত্যিই ঈর্ষা করার মত। আমার তো মনে পড়েনা পিনাকী কোনদিন আমাকে এভাবে হাতে করে কিছু তুলে দিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সুরে অন্য কথা বলেছিলেন—'অবশ্য সব লোক এক রকম হবে এমন কোন কথা নেই। পিনাকী শাড়ী টাড়ী খুব বোঝেনা।

মৃদুলাদের কানে সেই কথাগুলির মধ্যে যে ফাঁক ছিল তা ধরা পড়েছিল। সুস্মিতাদির কষ্ট তাদের মনেও সংক্রামিত হয়েছিল। একটি মানুষ আরেকটি মানুষকে দু'হাত ভরে শুধু দিয়ে চলেছে। প্রতিদানে পাচ্ছেনা কিছুই। তার উপচে পড়া থলি একটু একটু করে

শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিয়তিনির্দিষ্ট মানুষের মত অবস্থা তার। প্রতিকারের কোন উপায় নেই। সব মিলিয়ে বড় করুণ এক ছবি ফুটে উঠেছিল তাদের চোখের সামনে।

অনেক পরে স্মৃতিচারণের এক দুর্বল মুহূর্তে নিজের সেই নিঃস্ব চেহারা মেলে ধরেছিলেন সুস্মিতাদি। একজন নিপুণ কথাসাহিত্যিকের মত সুন্দরভাবে কথা সাজিয়ে নিজের অবস্থা অনাবৃত করে তুলে ধরেছিলেন।

সুস্মিতাদি বলেছিলেন—'ও আমাকে সব দিক দিয়েই নিঃস্ব করে দিয়েছে। অনেক কিছুই খুইয়েছি আমি ওর জন্য। সারা জীবনে আর সেগুলি ফিরে পাবনা। আমার যা করার ছিল, যা হবার ছিল তার সব সম্ভাবনা নিজের হাতে নষ্ট করেছি। মাঝে মাঝে ভাবি, আগের জন্মে আমি ওর এমন কি শত্রুতা করেছি যার জন্য ও এজন্মে এমনভাবে শত্রুতা করে চলেছে আমার সঙ্গে?'

কিন্তু সেই চরম শত্রুর মৃত্যুতে সুস্মিতাদি কেন এতখানি অধীর হয়ে উঠলেন তা ভেবে কূলকিনারা পেলনা মৃদুলা। নিজের মনের মধ্যে অনেক হাতড়ে হাতড়েও সুস্মিতাদির মানসিকতার কোন চিহ্ন কোথায়ও খুঁজে পেলনা। অপার বিস্ময়ে তার কেবলি মনে হতে লাগল একটি কথা—'আমি হলে কিছুতেই এভাবে ভেঙ্গে পড়তামনা। আমাকে যে লোক এত কষ্ট দিয়েছে তার অভাবে নিজের জীবন এভাবে অর্থহীন বলে ভাবতে পারতামনা আমি কিছুতেই।'

পাঁচ

গত রাত্রে দীপঙ্করের সঙ্গে ছোট্ট বচসা হয়ে গেল। কয়েকদিন ধরে দীপঙ্করের সঙ্গে তার কিছুটা কাঠকাঠ সম্পর্ক চলেছে। মৃদুলার মনে যে সুস্মিতাদিকে নিয়ে অনেক তোলপাড় চলেছে তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় দীপঙ্করের। কিন্তু বুঝেও সে জোর করেই যেন তা বুঝতে চায়না। প্রথম দু'একদিন সোজাসুজি মৃদুলাকে তার জন্য ধমক দিয়েছে সে। তাতে ফল কোন হয়নি দেখে শেষে নীরবতা অবলম্বন করেছে।

গত রাত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেছে। পরিস্থিতি সহজ করার জন্য সে ইচ্ছা করেই মৃদুলাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ছোট্ট একটি সস্নেহ তিরস্কার করেছিল—'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ দোলা। সুস্মিতাদির ভাগ্য তুমি হাজার চেষ্টা করেও ফেরাতে পারবেনা। হয়ত আগে তবু কিছু করণীয় ছিল। এখন যা হবার হয়ে গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। কিন্তু সুস্মিতাদির জন্য আমি বেচারা কেন শাস্তি পাব বলতে পার?'

মৃদুলার সহ্য হয়নি। সজোরে দীপঙ্করকে সরিয়ে দিয়ে সরোষে জবাব দিয়েছিল তার।

—দেখ এসব নীচতা আমার একদম ভাল লাগেনা। আমাদের জানাশোনা একজন মানুষ চোখের সামনে কষ্ট পাচ্ছে। সেটা দেখেও নির্বিকার থাকব এমন অমানুষ আমি নই। অবশ্য এটাও জানি যে সুস্মিতাদি না হয়ে অন্য কেউ হলে তুমি এতটা উদাসীন থাকতে পারতেনা। প্রথম থেকেই তোমার কোপনজরে পড়েছেন যে সুস্মিতাদি!

দীপঙ্করও ছেড়ে দিলনা।

—কথাটা খুব বেঠিক বলোনি। ঐ মহিলার কষ্ট ওর নিজের তৈরি। যা ঘটেছে তার অনেকখানির জন্যই দায়ী উনি নিজে। তুমি আমি তার জন্য দায়ী নই। ওর প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য নিজেদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বন্ধ করে দিতে হবে কোন যুক্তিতে?

মৃদুলা আর বাক্যব্যয় করেনি। দীপঙ্করের দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থেকেছে সে। একরাশ চিন্তা সারারাত ধরে পোকার মত কিলবিল করেছে তার মাথায়। সুস্মিতাদির প্রতি দীপঙ্করের বিরূপ মনোভাব তার অজানা নয়। এখন অবশ্য দীপঙ্কর ইচ্ছাকৃতভাবে রূঢ়তা দেখাচ্ছে। সেটা বুঝতে তার অসুবিধা হয়না। তবু তার রাগ হয়। দীপঙ্করের ওপরে তো বটেই। নিজের ওপরেও। নিজের ভূমিকার কথা অস্বীকার করবে কি করে? দীপঙ্কর যদি তার কষ্ট কিছুটা বুঝত তাহলে বুঝি মনের ভার লাঘব হতে পারত।

সকালে ঘুম থেকে উঠেও মৃদুলার মনটা পাথরের মত ভারী ঠেকছিল। যন্ত্রচালিতের মত প্রাত্যহিক কর্মগুলি করে গেল সে একের পর এক। দীপঙ্কর প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে

টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন ধরে দীপঙ্করই। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুলার উদ্দেশ্যে হাঁক দেয় সে—'দোলা, তোমার ফোন।'

মৃদুলা ঘরে আসার পর বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

—দরজাটা বন্ধ করো। আমি বেরোচ্ছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে দরজা বন্ধ করে ফোন ধরতে চলে আসে মৃদুলা। 'হ্যালো' বলতেই তারের অপর প্রান্ত থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—মৃদুলা, আমি শর্মিষ্ঠা বলছি। সুস্মিতাদির খবর জান ?

আত্মবিস্মৃত হয়ে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে মৃদুলা।

—কেন ? সুস্মিতাদির কি হয়েছে ?

—তুমি কিছু শোনোনি ? পিনাকীদা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

সম্বিত ফিরে পায় মৃদুলা।

—ও, সে খবর জানি। আমি হঠাৎ ভেবেছিলাম সুস্মিতাদিরই বুঝি কিছু হয়েছে।

—জান ? কাগজে দেখেছ খবরটা ?

—না না। কাগজে দেখিনি। সুস্মিতাদি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। ওর মুখেই শুনেছি।

—তাই নাকি ? সুস্মিতাদি খুব ভেঙ্গে পড়েছেন শুনলাম। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে পরশু সকালবেলা চিত্রিতা নাকি বাস থেকে ওকে দেখতে পেয়েছিল। ও গতকাল আমার বাড়ি এসেছিল। বলছিল সুস্মিতাদিকে নাকি কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছিল। ময়লা কাপড়চোপড় পরা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। কেমন যেন দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত হাঁটছিলেন। চিত্রিতা বলল, আর একটু হলেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত। একটা ট্রাকের সামনে প্রায় চলে এসেছিলেন উনি। ওকে তখন হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন এক ভদ্রলোক। চিত্রিতা নাকি ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল তাই দেখে। বাসের লোকেরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল দেখে পরে নাকি খুব লজ্জা পেয়েছিল।

মৃদুলা খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথা বলছিল।

—খুব আঘাত পেয়েছেন সুস্মিতাদি। আমার ধারণা ছিলনা পিনাকীদার মৃত্যুতে উনি অতটা ভেঙ্গে পড়বেন। এখন মানুষটা নেই।

তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে চাইনা। তবুও দেখেছি তো, সারাজীবন জ্বালিয়ে গেছেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন সুস্মিতাদিকে সুখ দেননি।

তারের অপর প্রান্তে শর্মিষ্ঠাও সায় দিল।

—আসলে সুস্মিতাদি যাই করুন পিনাকীদাকে কিন্তু খুব ভালবাসতেন। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পরও ওর খোঁজখবর কিভাবে রাখতেন দেখেছ তো? পিনাকীদাকে যে উনি জ্বালিয়েছেন তাও সেই ভালবাসারই তাগিদে।

স্কুল সংক্রান্ত দু' চারটি কথাবার্তার পর ফোন ছেড়ে দিল শর্মিষ্ঠা। মৃদুলাকে আবার পেয়ে বসল সুস্মিতাদির চিন্তা। শর্মিষ্ঠার মুখে ওঁর ট্রাকের সামনে পড়ার কথাটা শুনে ওর মনে হয়েছিল, উনি অসতর্কতাবশে হঠাৎ এসে পড়েননি ট্রাকের সামনে। আত্মহত্যার তাগিদেই হাঁটছিলেন তিনি এভাবে। অতঃপর কি ঘটতে পারে ভেবে শিউরে উঠছিল মৃদুলা। সেই সঙ্গে স্মৃতিচারণের সূত্রে মনে পড়ছিল অনেক কথা।

ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে পিনাকীদার যখন প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা চলেছে তখন সুস্মিতাদির এক রকম মাথা খারাপ অবস্থা। মাঝে মাঝেই অধীর হয়ে উঠতেন। যা মনে আসত বলতেন। সেই সময়ে একদিন মৃদুলাকে তিনি বলেছিলেন—'জানিস আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয়? মনে হয় ওকে খুন করি। তারপর যা আমার কপালে আছে হোক। এত বড় নির্লজ্জ ঐ লোক যে প্রায় মেয়ের বয়সী একটা মেয়ের সঙ্গেও অবৈধ সম্পর্ক পাতাতে ওর বাঁধলনা? সব ভুলে গেল? অতীতকে এভাবে ভুলে যেতে পারে কোন মানুষ? আমি ওর জন্য কি না করেছি? বাড়িতে সকলের কাছে ওর জন্য কম কথা শুনেছি? আমার রুচি নিয়ে কম কথা শুনিয়েছে বাড়ির লোকে? সব অগ্রাহ্য করেছি একটা লোকের জন্য। ওকে যদি খুনও করি আমার বিশ্বাস জজসাহেব সব কথা শুনে আমাকে চরম দণ্ড দিতে পারবেননা কিছুতেই।'

আরেকদিন বলেছিলেন অন্য কথা।

—এত লোক মরে! ও কেন মরে না বলতে পারিস? ও মরলে আমার মান বাঁচত।

বিয়ের আগেও পিনাকীদাকে নিয়ে জ্বালা কম ছিলনা। কিন্তু তখন সুস্মিতাদির মুখে ওরকম কথা শোনেনি মৃদুলা। তখন অনেক রেখে

ঢেকে তবে নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতেন তিনি। এত বছর ধরে সব কিছু দেখার পর মৃদুলার মনে হয় হয়ত বা প্রথম থেকেই সুস্মিতাদির প্রতি পিনাকীদার ভালবাসায় ঘাটতি ছিল। সুস্মিতাদির তাগিদেই যেন পিনাকীদা তার সঙ্গে প্রেম করেছেন, পরে তার ইচ্ছাতেই তাকে বিয়ে করেছেন। তার মধ্যে হৃদয়ের তাগিদ শতকরা কত ভাগ ছিল তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা। সুস্মিতাদি কিন্তু বহু বছর ধরে পিনাকীদার সঙ্গে প্রেম করার পরও হৃদয়ের তাগিদ খোয়াননি।

রেজিস্ট্রি করেই বিয়ে হয়েছিল দুজনের। তবু বেনারসী পরেছিলেন, চন্দনের কনেসাজ পরেছিলেন সুস্মিতাদি। খোপায় দিয়েছিলেন ফুলের মালা। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা একেবারে কম হয়নি। মৃদুলা শুনেছিল বিয়ের যাবতীয় খরচ নাকি একরকম সুস্মিতাদিই বহন করে-ছিলেন। একসময় পরিবারের সকলেই বিরোধী ছিলেন সেই বিয়ের। পিনাকীদাকে কেউই সুস্মিতাদির যোগ্য বলে মনে করেননি। সুস্মিতাদি সেকথা চিরদিন লালন করেছেন মনে।

বিয়েটা হয়েছিল দুর্গাপুরেই। ছেলের বাড়ির লোকজনের তবু কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বিবাহ উপলক্ষে তাদের দুর্গাপুরে থাকার সব ব্যবস্থাই সুস্মিতাদি সম্পন্ন করেছিলেন। বাড়িভাড়া থেকে আরম্ভ করে আনুষঙ্গিক অনেক ব্যবস্থাই নিজে উদ্যোগী হয়ে সমাধা করেছিলেন। পিনাকীদার যেন কোন দায়ই ছিলনা। বিয়েতে রাজী হয়ে ধন্য করে দিয়েছিলেন যেন তিনি। সুস্মিতাদির যারা প্রতিপক্ষ তারাও কিন্তু একই কথা বলেছিল।

পিনাকীদার ভাবটা চিরকালই এক রকম রয়ে গিয়েছিল। 'জলে নামব কিন্তু বেণী ভিজবেনা' গোছের ভাব। সুস্মিতাদিও মেনে নিয়েছিলেন সেটি। তার নিজের বাড়ি থেকে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের মত আচরণ করেছিলেন। মানসিক দিক দিয়ে সুস্মিতাদি তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বলেই তার তাতে কিছু এসে যায়নি।

বহু বছরের শবরীর প্রতীক্ষা শেষ করে বাঞ্ছিত ব্যক্তিটিকে লাভ করে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন তিনি। মৃদুলারা অনেকেই তার সেই হাস্যোৎফুল্ল রূপ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অতি পরিচয় বাসনার তাপ কমিয়ে দেয় বলেই জানত তারা। সুস্মিতাদিকে তার

ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল তাদের। মৃদুলার মনে যে প্রশ্ন গুঞ্জরণ করে ফিরছিল তা সে ভাষায় ব্যক্ত না করে পারেনি।

সুস্মিতাদি তার প্রশ্ন শুনে সকৌতুক হাসি হেসেছিলেন। প্রশ্নটা যে খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক তা স্বীকার করে নিয়েই মৃদুলার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন তিনি।

—এতদিন তো সামাজিক স্বীকৃতি মেলেনি! এখন সেটা মিলল। পিনাকীর সাধ্য কি আমাকে অস্বীকার করে?

এত বছর পর মৃদুলার মনে হয় অন্তরীক্ষে বিধাতাপুরুষ বুঝি নিঃশব্দে হেসেছিলেন সেকথা শুনে। সুস্মিতাদি যতই পিনাকীদাকে বাঁধবার চেষ্টা করুন না কেন বারে বারে পিনাকীদা সেই বাঁধন কেটে বেরিয়ে এসেছেন। কোন দিনই বুঝি পুরোপুরিভাবে সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা থাকতে চাননি।

তবে তার আশ্চর্য লাগত সুস্মিতাদির কথা শুনে। যে মানুষটা জাতপাত কুলশীল কোন কিছু গ্রাহ্য করলনা, পারিবারিক ভ্রূকুটি তুচ্ছ করল এবং প্রচলিত অর্থে তার সম্পূর্ণ অযোগ্য একটি মানুষকে নির্ভীক সাহসের সঙ্গে নির্বাচন করল সেই মানুষই আবার বিয়ের মত একটি সামাজিক প্রথাকে আশ্রয় করে তার প্রেমকে, পিনাকীদার সঙ্গে তার সম্পর্ককে একটা প্রথাগ্রাহ্য রূপ দিতে চাইল। তার চেয়েও বড় কথা পিনাকীদার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে সম্ভাব্য রন্ধ্রপথগুলি বন্ধ করে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার সম্ভাবনা নিশ্ছিদ্র রাখতে চাইল।

এসব কথা যখনি চিন্তা করে মৃদুলার মনে হয় আগাগোড়া বুঝি বৈপরীত্যে ভরা সুস্মিতাদির চরিত্র। চিন্তাভাবনায় প্রচণ্ড রকমের আধুনিক হয়েও প্রাচীনাদের মত কুসংস্কারের নাগপাশে বাঁধা রইলেন। সাহিত্যের আলোচনায় যার চিন্তার স্বতন্ত্রতা ও মৌলিকতা সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করত, ব্যক্তিগত জীবনে তার হাজার রকমের টানাপোড়েন ছিল সকলের কাছেই সীমাহীন অস্বস্তির বিষয়।

মৃদুলা অনেক সময়েই ভেবে পেতনা বুদ্ধিমতী হয়েও সুস্মিতাদি কেন এভাবে পিনাকীদাকে একমেব অবলম্বন করে আঁকড়ে থাকতে চাইতেন। প্রাচীনাদের মত স্বামী সৌভাগ্যকে জীবনের চরম পাওয়া বলে মনে করতেন। তার জন্য অনেক সময় যে মূল্য দিতেন মৃদুলাদের কাছে তা অকল্পনীয় ঠেকত। নিজেকে কি কম হাস্যস্পদ করেছেন তার

জন্য? দু'পক্ষে অনুভূতির পাল্লা সমান সমান হলে হয়ত অপরের কাছে নিজেকে তিনি এভাবে হাস্যাস্পদ করে তুলতেননা। মৃদুলারা তো কম বোঝায়নি।

ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে যখন পিনাকীদার ঘনিষ্ঠতা সুরু হয়েছে তখন প্রায়ই ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় হানা দিতেন। পিনাকীদার সঙ্গে, ভুবনেশ্বরীর বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। পরে দুর্গাপুরে ফিরে এসে যখন সেকথা মৃদুলা বা অনসুয়াদিকে আবার বিস্তারিত করে শোনাতেন তখন মৃদুলারা অনুযোগ করত এই বলে যে কাজটা তিনি ঠিক করেননি। নিজেকে ছোট করে ফেলছেন কেবলি।

সুস্মিতাদি করুণ স্বরে আত্মসমর্থন করতেন এই বলে যে তিনি কি করবেন? স্বামীকে ফিরে পেতে এসব তো তাকে করতেই হবে। বলতেন পিনাকীদা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছেন। ভুবনেশ্বরীর মা তুকতাক করে তাকে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করছেন। তিনি যদি রাগ করে সব চেষ্টা ছেড়ে দেন তাহলে সর্বনাশের ভরা গঙ্গা বয়ে যাবে তার জীবনে। আরও যেসব কথা বলতেন তার সারবস্তু খুব আলোকিত চিন্তাভাবনার প্রমাণ দিতনা। তাদের দুর্গাপুরের স্কুলে আরও কতজন তো প্রেম করে বিয়ে করেছে। কিন্তু এমন সর্বগ্রাসী স্বামীপ্রেম আর কারুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেনি মৃদুলা।

বিয়ের পর প্রথম দু'বছর খুব সুখে কাটিয়ে ছিলেন সুস্মিতাদি। মৃদুলারা সুস্মিতাদির মধ্যে কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখতে পেয়েছিল। পিনাকীদা তখন প্রায়ই দুর্গাপুরে এসে থাকতেন। কখনও বা সুস্মিতাদিও ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে যেতেন। চোখের সামনে যতটুকু প্রত্যক্ষ হয়েছে তা তাদের সুখী যৌথ জীবনের ছবিই তুলে ধরেছে।

সুস্মিতাদির চেহারায় হঠাৎ যেন লাবণ্যের জোয়ার এসেছিল। রাগ দ্বেষ বিদ্বেষ অনেক কমে গিয়েছিল। অনেক স্বাভাবিক আর স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল তার আচরণ। বয়স যেন অনেকটা কমে গিয়েছিল।

মাঝে মাঝে সুস্মিতাদির কোয়ার্টার্সে গিয়ে তাদের সেই সুখী জীবনের টুকরো টুকরো দৃশ্য চোখে পড়েছে। মৃদুলা দেখেছে দু'জনে মিলে কচ ও দেবযানী আবৃত্তি করছেন। কিংবা দ্বৈতকণ্ঠে কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন।

পিনাকীদাকে সুস্মিতাদির চেয়ে অনেকটাই ছোট দেখাত। কিন্তু কখনও কখনও সুস্মিতাদি আত্মবিস্মৃত হয়ে পিনাকীদার সঙ্গে যেভাবে কথা বলতেন তাতে মৃদুলারা অস্বস্তি বোধ করত। বাচ্চা মেয়ের মত আহ্লাদে গলে পড়া সেই চেহারা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে উপভোগ্য হতে পারেনা। কিন্তু সুস্মিতাদির তখন সুখের ঘোরে বিহ্বল অবস্থা। অপরের চোখে নিজেকে দেখার ক্ষমতা আর অবশিষ্ট ছিলনা তখন তার মধ্যে। তার নিজের মুখেই শুনেছে মৃদুলা যে তার দিনরাত তখন স্বপ্নের ঘোরে কাটত। সারা জীবনে তেমন নির্ভেজাল আনন্দ আর কখনও পাননি তিনি।

পিনাকীদা কলকাতায় থাকলে পাগলের মত হয়ে যেতেন। একের পর এক চিঠি লিখতেন, ট্রাঙ্ককল্ করতেন। পিনাকীদাও সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তখন। কিন্তু তবু সুস্মিতাদির পাগলামি তার মধ্যে দেখা যেতনা। অপরের চোখে তার আচরণ তাই অশোভন ঠেকতনা। মাত্রাজ্ঞানের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিতনা তার কথায় বা আচরণে।

তবু শারীরিক নৈকট্যের কারণেই হোক কিংবা সুস্মিতাদির পরিশীলিত গুণাবলীর স্বাদে ভরপুর হওয়ার কারণেই হোক পিনাকীদা সুস্মিতাদির সেই সুখের অংশীদার হয়েছিলেন। দুজনেই দুজনের সান্নিধ্যে ভরপুর ছিলেন সেই সময়।

কিন্তু সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী। বহু বছরের প্রতীক্ষা শেষে যে সুখের সূর্যোদয় ঘটল তার রশ্মি মিলিয়ে গেল খুব তাড়াতাড়িই। বিয়ের দেড় বছরের মাথায় সুস্মিতাদির একটি পুত্রসন্তান হয়। মাত্র তিন মাস বয়সেই সর্দিকাশিতে ভুগে মারা যায় ছেলেটি। খুব শোক পেয়েছিলেন তখন সুস্মিতাদি। তার আর পিনাকীদার যৌথ জীবনের সেই যোগফল এভাবে যে মিথ্যে হয়ে যাবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। সুস্মিতাদি আবার সন্তান চেয়েছিলেন। কিন্তু পিনাকীদা সহযোগিতা করেননি। তখন থেকেই সুরু হয়েছে তাদের সম্পর্কের মধ্যে ভাটার টান। সুস্মিতাদি স্বমুখে ব্যক্ত করার আগেই মৃদুলারা বুঝে গেল সব কিছু।

বিয়ের পর সুস্মিতাদির আচরণ অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। মেয়েদের আবার খুব মন দিয়ে পড়াতে সুরু করেছিলেন। স্কুলে এসে আগের মত ক্লাস ফাঁকি দিতেননা। সহকর্মীদের সঙ্গেও আর খটাখটি

হোতনা। সুখের ঘোরে ছিলেন যেন তখন সুস্মিতাদি। নিন্দুকের পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল তার সেই পরিবর্তন দেখে।

কিন্তু সুখের ঘোর কেটে যেতেই আবার অন্য মূর্তি ধারণ করলেন তিনি অচিরে। পারিবারিক শান্তির অভাব আবার তাকে অসহিষ্ণু করে তুলল। স্কুলে হাজিরা আবার অনিয়মিত হয়ে উঠল। সহকর্মীদের অসন্তোষের গুঞ্জন সুরু হয়ে গেল তাকে কেন্দ্র করে। মৃদুলাদের সঙ্গে পর্যন্ত রূঢ় আচরণ করতে সুরু করলেন তিনি।

পিনাকীদার দুর্গাপুরে আসা অনেক কমে গেল। বিয়ের পর সপ্তাহে সপ্তাহে তো বটেই তাছাড়াও ছুটিছাটায় যিনি ঘন ঘন দুর্গাপুরে আসতেন তিনি হঠাৎ তার আসা অনেক কমিয়ে দিলেন। প্রথম প্রথম সুস্মিতাদি হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন পিনাকীদার আগমনের প্রত্যাশায়। পিনাকীদা দায়সারা গোছের তার পাঠাতেন ওজুহাত স্বরূপ। তিনি ব্যস্ত আছেন, পরে যোগাযোগ করবেন এই মর্মে তার পেয়ে সুস্মিতাদির হৃদয়বেদনার উপশম ঘটতনা।

তবুও তিনি প্রতীক্ষা করে থাকতেন। দিনের পর দিন চলে যেত। কিন্তু পিনাকীদার দেখা মিলতনা। সুস্মিতাদি চিঠি পাঠাতেন। কখনও বা টেলিগ্রাম করতেন উৎকণ্ঠিত হয়ে। ক্রমাগত পত্রাঘাত বা তারাঘাতে ব্যতিব্যস্ত হয়েই আবার সেই বার্তা পাঠাতেন যার মূল কথা ছিল—তার পক্ষে কাজের চাপের দরুন এখন আসা সম্ভব হচ্ছেনা। সুস্মিতাদি যেন অকারণ চিন্তা না করেন। যথাসময়ে তিনি নিজেই আবার যোগাযোগ করবেন।

মৃদুলারা সুস্মিতাদির দুঃখে কষ্টে অপমানে উন্মাদিনীপ্রায় অবস্থা দেখে কষ্ট পেত। কিন্তু পরিত্রাণের উপায় জানা ছিলনা বলে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছিল তাদের। সুস্মিতাদি আর পিনাকীদার জীবন যে ত্রিভুজ কাহিনীর অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তা তাদের তখনও জানা ছিলনা।

সুস্মিতাদির প্রতি পিনাকীদার যে আর আগের মত টান নেই তা বুঝতে তাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। প্রথম থেকেই তারা সেই সম্পর্কের মধ্যে সুষম ভারসাম্যের অভাব প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু নতুন যে উপসর্গ দেখা দিয়েছিল তার কথা জানা ছিলনা তাদের।

কিন্তু এসব জিনিষ বেশিদিন চাপা থাকেনা। সুস্মিতাদির মুখে

সেই বৃত্তান্ত শোনার আগেই মৃদুলাদের কানে পেঁছে গেল অভাবিত সেই কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে পিনাকীদার আচরণের রহস্যও উন্মোচিত হয়ে গেল। একাধিক শিক্ষিকার মুখে শোনা গেল পিনাকীদাকে একটি অল্প বয়সী মেয়ের সঙ্গে বহু জায়গায় ঘুরতে ফিরতে দেখা যাচ্ছে।

পরে জানা গেল প্রায় মেয়ের বয়সী সেই মেয়েটি নাকি সঙ্গীতশিল্পী ভুবনেশ্বরী ঘটক। ইতিমধ্যে খানিকটা নাম করেছে সে। তার মূলে রয়েছে পিনাকীদার সাগ্রহ প্রচেষ্টা। ক্রমে নতুন নতুন তথ্য সংযোজিত হতে থাকে। দুজনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কানাঘুষো সুরু হয়ে যায়। তার ঝাঁজ সুস্মিতাদিকেও বাদ দিয়ে গেলনা।

সুস্মিতাদিকে দেখে তার অপমানিত দুঃখী হৃদয়টির যন্ত্রণা বুঝতে পারত মৃদুলারা। তবু প্রকাশ্যে ভয়ে সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ করতে পারতনা। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কি হবে? তাছাড়া সুস্মিতাদি তখন আর স্বাভাবিক ছিলেননা। হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সুস্মিতাদি নিজেই একদিন অনসূয়াদি ও মৃদুলার কাছে ভেঙে পড়লেন।

—তোরা আমায় একটু সাহায্য কয়তে পারবি? আমার মাথা ঠিক নেই। কি করব বুঝতে পারছিনা।

মৃদুলারা অনুমান করতে পেরেছিল সুস্মিতাদি কোন ব্যাপারে কথা বলবেন। তবু তারা ধরা দেয়নি। পাছে সুস্মিতাদি তাদের কথায় রুষ্ট হন। নিঃশব্দে সুস্মিতাদির মুখের দিকে তাকিয়ে তারা অপেক্ষা করছিল সেই ভয়ংকর ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনার জন্য।

সব সন্দেহের নিরসন হয়েছিল সেদিন। স্কুল ছুটির পর নিজের কোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়েছিলেন দুজনকে। ভুবনেশ্বরীর অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছিল তাদের কাছে।

কিছুকাল আগে কর্মসূত্রে কুচবিহারে বদলী হয়েছিলেন পিনাকীদা। পাড়ার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভুবনেশ্বরীর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যান তিনি। অতঃপর আগ্রহপরবশেই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে আলাপ করেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তাদের পাড়াতেই থাকে ভুবনেশ্বরী। অতঃপর ভুবনেশ্বরীর মা বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গেও আলাপ হয় তার। ভুবনেশ্বরীর গান শোনার তাগিদে প্রায় রোজই গিয়ে উপস্থিত

হতে থাকেন তাদের বাড়ি। ক্রমশঃ গোটা পরিবারের সঙ্গেই হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

একবার কুচবিহারে স্বামীর কর্মস্থলে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন সুস্মিতাদি। পিনাকীদা তার সঙ্গে ভুবনেশ্বরীর বাড়ির সকলের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে আলাপ করে, তার অনুপম কণ্ঠের গান শুনে স্বামীর মত তিনিও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

পিনাকীদা সুস্মিতাদির কাছে তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভুবনেশ্বরী ঠিকমত তালিম ও সুযোগ পেলে কালে বড় শিল্পী হয়ে উঠবে। অত সুন্দর কণ্ঠ তো সচরাচর দেখা যায়না! তাছাড়া মেয়েটির সঙ্গীতে আগ্রহ বা নিষ্ঠাও অপরিসীম। প্রায় মেয়ের বয়সী ভুবনেশ্বরীকে নিয়ে যে তাদের দাম্পত্যজীবনে কোন অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেননি সুস্মিতাদি।

নিঃসন্তান সুস্মিতাদি বরং বাৎসল্য বোধ করেছিলেন মেয়েটিকে দেখে। স্বামীর সঙ্গে তিনিও ভেবেছিলেন মেয়েটির প্রতিভার বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। প্রথম প্রথম স্বামীকে তিনি সে ব্যাপারে উৎসাহই দিয়েছেন।

পিনাকীদার সঙ্গে সঙ্গীত জগতের, নাট্য জগতের ও চলচ্চিত্র জগতের বহু হোমড়া চোমড়া লোকের চেনাপরিচয় ছিল। ভুবনেশ্বরীকে একে একে তাদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একাধিক সিনেমা ও নাটকের জন্য নেপথ্য গায়িকা হিসাবে চুক্তিবন্ধ হোল ভুবনেশ্বরী। বহু সঙ্গীত সম্মেলনেও গান গাইবার জন্য আমন্ত্রিত হোতে থাকে সে।

পিনাকীদা যেন ভুবনেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠিত করার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। ভুবনেশ্বরী কিংবা তার পরিবারের লোকজনের থেকেও বেশি উদ্যোগী ছিলেন তিনি সে ব্যাপারে। একজন বড় ওস্তাদের কাছে ভুবনেশ্বরীর গান শেখারও ব্যবস্থা করে দেন। শোনা যায় ভুবনেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থব্যয়েও নাকি কার্পণ্য ছিলনা তার।

ভুবনেশ্বরীর বাবা, বিশেষ করে মা অকুণ্ঠে মেনে নিলেন পিনাকীদার অভিভাবকত্ব। সব জায়গাতেই ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে থাকতেন পিনাকীদা। চাকরির সময়টুকু বাদ দিলে বেশির ভাগ সময়ই পড়ে থাকতেন তিনি ভুবনেশ্বরীর বাড়িতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কোন সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য যখন অন্যত্র যাবার প্রয়োজন হোত তখনও ভুবনেশ্বরীর সঙ্গী হতেন পিনাকীদা।

প্রথম প্রথম ভুবনেশ্বরীর মা তাদের সঙ্গে থাকতেন। পরে তিনিও সব সময় থাকতে পারতেননা। অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন পিনাকীদা। এসব জিনিস অনেকের কাছেই ভাল ঠেকতনা। নানা জনে নানা কথা রটনা করত। সুস্মিতাদির কানে দুজনকে জড়িয়ে অনেক কথাই এসে পৌঁছত।

প্রথম প্রথম তিনি সেগুলি গ্রাহ্য করতেননা। মেয়েটিকে তিনি দেখেছেন। তার সঙ্গে আলাপ করেছেন। অল্প বয়সী মিস্টি স্বভাবের মেয়ে। তার মধ্যে কোন রকম ধূর্তামি, কপটতা বা নোংরামি দেখেননি। মেয়েটিকে তার ভালই লেগেছিল। লোকেরা অনেক রকম কথা রটায়। সেসব বিশ্বাস করলে চলেনা। রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'লোক না পোক।' তার মনে সত্যিই কোন ধন্দ আসেনি তখন।

পরে সমস্ত ব্যাপারটাকে 'কিছুনা' কিংবা 'সাধারণ ব্যাপার' বলে আর উড়িয়ে দিতে পারলেননা। পিনাকীদা এক সময় দুর্গাপুরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এক রকম। দিনের পর দিন যায়। দুর্গাপুরে আসার সময় হয়না। কলকাতায় গিয়েও তার দেখা পাননা সুস্মিতাদি। ভুবনেশ্বরীর ভবিষ্যৎ গড়ায় এত ব্যস্ত তিনি যে স্ত্রীর খোঁজখবর রাখারও সময় পাননা।

সর্বতো অর্থে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন সুস্মিতাদি। বিবাহপূর্ব জীবনের নিঃসঙ্গতা এক রকমের। বিবাহোত্তর জীবনের নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি মর্মান্তিক। বিশেষতঃ যদি স্বামীকে অন্য মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে নানা রটনা চলে লোকমুখে তাহলে বাড়তি প্রাপ্য হিসাবে জোটে গ্লানি বা অপমান। তবু সুস্মিতাদি ভেবেছেন পুরুষ মানুষের মন! ওরকম একটু আধটু স্খলন হতেই পারে। তিনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু পিনাকীদার একেবারে মাতাল অবস্থা। সুস্মিতাদির চেষ্টা নিষ্ফল হোল। তিনি যখন বললেন যে মেয়ের বয়সী ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে লোকে যে নানা কথা বলছে তাতে কি তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে?

পিনাকীদা তখন নির্লজ্জভাবে জবাব দিলেন—মায়ের বয়সী মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেই বা তার সম্মানটা কি বেড়েছে ?

এতটা নির্লজ্জতা আশা করেননি সুস্মিতাদি। তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—'আমি তোমার মায়ের বয়সী ? আমার বয়স তুমি জাননা ? তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় কবে হয়েছে ? তাহলে আজ একথা আসছে কেন ?'

পিনাকীদা নির্দ্বিধায় রাগতভাবে জবাব দিয়েছেন—'কিছু বেঠিক বলিনি। সত্যি কথা অনেক সময়েই শ্রুতিকটু হয়। সমবয়সী স্ত্রীকে নিয়ে কোন পুরুষ সারাজীবন সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা। তুমি এত বুদ্ধির বড়াই করো আর একথাটা বুঝতে পারনা ?'

সুস্মিতাদি এক মুহূর্ত নির্বাক ছিলেন। ওরকম নিষ্ঠুর কথার লাগসই জবাব খুঁজে পাননি তিনি। পরে একটু ভেবে অনুযোগ করেছেন।

—কিন্তু তোমাকে কি আমি জবরদস্তি করে বিয়ে করেছি ? তুমি না চাইলে নিশ্চয়ই এ বিয়ে হতোনা।

আগের মতই অনমনীয় ভঙ্গীতে জবাব দিয়েছেন তখন পিনাকীদা।

—জবরদস্তি নয় তো কি ? তুমি তো সেই কবে দুষ্টগ্রহের মত উদয় হয়েছ। তোমার হাত থেকে ছাড়ান পাওয়ার উপায় কি ? তুমি কি মনে কর আমি তোমার প্রেমে গদগদ হয়ে তোমায় বিয়ে করেছি ? যদি তা ভেবে থাক তাহলে শোন আমি তোমাকে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করিনি। আমি বাধ্য হয়েছি বিয়ে করতে। তুমি তো কবে থেকে দখলদারি নিয়ে বসেছ। আমার কি উপায় ছিল তোমার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ?

আগেও অনেকবার পিনাকীদার সঙ্গে মতান্তর বা মনান্তর হয়েছে। কিন্তু সেদিনের মত শক্ত কথা আর কোনদিন বলেননি পিনাকীদা। বিষাক্ত তীরের মত প্রতিটি কথা সুস্মিতাদির বুকের মধ্যে বিঁধে যাচ্ছিল। আর কেউনা দেখলেও সুস্মিতাদি দেখতে পাচ্ছিলেন তার বুকের মধ্যে গলগল করে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। হাজার চেষ্টা করেও তাকে সামাল দিতে পারছেননা।

তবু তিনি চেষ্টা করেছিলেন মাথা শান্ত করে স্বামীকে বোঝাতে। স্বামী স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের কথা তুলে স্বামীকে বলেছিলেন তাদের

বন্ধন অচ্ছেদ্য। পিনাকীদা আরও যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সেসব শুনে। সুস্মিতাদি তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন কেমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন পিনাকীদা।

গলার স্বর চড়া পর্দায় তুলে সুস্মিতাদির কাছে মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি।

—তোমার ওসব ছেঁদো কথায় আমি বিশ্বাস করিনা। কোন সম্পর্কই অচ্ছেদ্য নয়। আমি মুক্তি চাই সুস্মিতা। মুক্তি। আমাকে রেহাই দাও তুমি।

ঘটনার কাঠামো জানা ছিল তাদের। জানা ছিলনা তার আদি মধ্য অন্তের সীমানাবিন্যাস। অনসূয়াদির সঙ্গে মৃদুলাও অবাক হয়ে গিয়েছিল পিনাকীদার নিষ্ঠুরতার বহর দেখে। দুহাত ভরে যে মানুষটা সুস্মিতাদির কাছে শুধু নিয়েই এসেছে তার কি একবারও লজ্জা হোলনা ওসব কথা বলতে? সুস্মিতাদিকে অস্বীকার করে কি করে ঐ মানুষ?

কৈশোর থেকে সুস্মিতাদি তাকে এক রকম গড়ে পিটে নিয়েছেন। এক হিসাবে পিনাকীদা সত্যি কথাই বলেছেন। মায়ের মতই অসীম স্নেহে মমতায় নিজের আশা আকাঙখার তাপে তাকে গড়ে তুলেছেন তিনি। আজ তার পায়ের নীচে যে শক্ত মাটি রয়েছে তাও তো সুস্মিতাদিরই দান। তবু সব কিছু কত সহজে বিস্মৃত হলেন তিনি। এত বছরের সখ্য, প্রেম সব মিথ্যা হয়ে গেল!

অনসূয়াদির মত মৃদুলাও কোন কথা খুঁজে পায়নি। সুস্মিতাদি সর্বস্ব হারানোর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'তোরা বলতে পারিস আমি কি করব?'

এ প্রশ্নের জবাব খুব কঠিন ছিলনা। মৃদুলার মনে হয়েছিল সুস্মিতাদিকে সে বলে—'এত সবের পরও আপনার দ্বিধা কিসের? পিনাকীদা যখন মুক্তি চাইছেন তখন আপনি তাকে জোর করে বেঁধে রাখছেন কেন? বিবাহবিচ্ছেদই তো সর্বোত্তম সমাধান এক্ষেত্রে।'

তবু সে ওসব কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারেনি। সুস্মিতাদিকে ভাল করে চিনেছিল বলেই তাকে ওসব বলতে তার মুখে বেধেছিল।

সুস্মিতাদি অবশ্য তাদের জবাবের জন্য অপেক্ষা করেননি। একটুক্ষণ আগের অসহায় দীন ভঙ্গী ততক্ষণে অন্তর্হিত হয়েছিল। তার চোখে

ধক করে জ্বলে উঠেছিল আগুন। অনসূয়াদির দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ন স্বরে চেঁচিয়ে মর্মবিলাপ করেছিলেন।

—ঐ ডাইনি আমার এত বড় সর্বনাশ করল? মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিল? ওর কখনও ভাল হবে? ঈশ্বর নেই? তিনি সব দেখতে পাচ্ছেননা? আমি ওর কি ক্ষতি করেছিলাম? এত বড় শয়তান স্বার্থপর আর নীচ ঐ মেয়ে মানুষটা? তোদের বলে রাখছি আমার মত ওকেও একদিন এমন ভাবেই কষ্ট পেতে হবে। আজ আমাকে যেভাবে কাঁদাচ্ছে ওকেও একদিন সেভাবে কাঁদতে হবে। দেখিস তোরা! ভগবান কখনই ক্ষমা করবেননা।

মৃদুলা বিস্মিত হয়েছিল। যে মেয়ের জন্য পিনাকীদার মনের এত পরিবর্তন তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলছেননা সুস্মিতাদি। তার যত রাগ সব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে কেবলি ভুবনেশ্বরীর মায়ের বিরুদ্ধে? ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হয়েছিল।

অজান্তেই তার বিস্ময় প্রকাশ করে ফেলেছিল সে।

—ভুবনেশ্বরীর মাকে শুধু দোষ দিচ্ছেন কেন সুস্মিতাদি? ভুবনেশ্বরীর দোষ কি কিছু কম?

জবাবে সুস্মিতাদি যা বলেছিলেন তা শুনে মৃদুলার মনে হয়েছিল সুস্মিতাদির মনের তল পাওয়া সত্যিই বড় কঠিন। এত সব ঘটে যাওয়ার পরও ভুবনেশ্বরীর বিরুদ্ধে একটিও শক্ত কথা বলেননি তিনি। সমস্ত অঘটনের জন্য দায়ী করেছেন কেবলমাত্র তার মাকে।

—ও ফুলের মত মেয়ে। ওকে তো আমি দেখেছি। ওর মধ্যে কোন পাপ ছিলনা। ওর মা-ই মেয়েকে টোপ ফেলে পিনাকীকে বড়শিতে বেঁধেছে।

শুনে অনসূয়াদি প্রতিবাদ না করে পারেননি।

—তুই বড় একপেশে। মায়ের দোষ আছে নয় বুঝলাম। কিন্তু মেয়েও তো শিশুটি নয়? ও কেন পিনাকীর সঙ্গে ওভাবে মিশল?

সুস্মিতাদি রেগে উঠেছিলেন।

—তোরা ওকে দেখিসনি। গন্ধর্বনিন্দিত গলা। গান ওর ধ্যান জ্ঞান সাধনা। পিনাকী আর ওর মায়ের ইচ্ছার পুতুল হয়ে চলেছে।

সুস্মিতাদির বিচিত্র জবাব শুনে মৃদুলারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

সুস্মিতাদি সেসব আদৌ লক্ষ্য না করে নিজের ঘোরে আবার অনেক কিছু বলে গিয়েছিলেন।

—ওর মা খুব ধান্দাবাজ মহিলা। মেয়ে যাতে উঠতে পারে তার জন্য না করতে পারে এমন কোন কাজ নেই। মেয়েকে একরকম লেলিয়ে দিয়েছিল পিনাকীর পিছনে। বাবা ভালমানুষ। স্ত্রী যা বলে মেনে নেন। ভুবনেশ্বরী শিল্পী হিসাবে ওপরে উঠতে চাইছে। ওর মা চাইছে ও অনেক টাকা রোজগার করে। মেয়ের দৌলতে বাড়ি গাড়ি টাকার স্বপ্ন দেখছে ঐ মহিলা।

মৃদুলারা চুপ করে শুনে গিয়েছিল। মা যে ধান্দাবাজ সে ব্যাপারে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু তা বলে মেয়ে একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা হতে পারেনা। একটি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে কেবলমাত্র অপরের ইচ্ছায় চালিত হচ্ছে এ চিন্তা তাদের কাছে অকল্পনীয়। প্রতিবাদ নিষ্ফল হবে জেনে চুপচাপ শুনে গিয়েছিল তারা সব কিছু।

সুস্মিতাদি বরাবরই কিছুটা একপেশে। তবে ওরকম ব্যাপারেও সেই একপেশেমী দেখে তাদের খুব আশ্চর্য ঠেকেছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে সুস্মিতাদিকে কোনদিনই যা-তা বলতে শোনেনি তারা। বরাবর সস্নেহ মন্তব্য করতে দেখেছে।

সুস্মিতাদির চরিত্রে অনেক অসঙ্গতি সত্ত্বেও বাৎসল্য রসের প্রভাব যে খুব বেশি তা তারা বহুদিন লক্ষ্য করেছে। সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিতে কি খুশিই না হয়েছিলেন! সেই সন্তান মারা যেতে দুঃখও বড় কম পাননি। বহুদিন পাগলের মত হাউ হাউ করে কেঁদেছেন তার মৃত সন্তানের কথা মনে করে। পরে আবার সন্তান চেয়েছিলেন। পিনাকীদা সহযোগিতা করেননি।

মাঝখানে একটি বাচ্চা মেয়েকে ফাইফরমাস খাটার জন্য রেখেছিলেন তিনি। অল্প দিনের মধ্যেই তাকে কেন্দ্র করে সুস্মিতাদির বাৎসল্য রসের ধারা স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পেল। তার জন্য দামী ফ্রক থেকে আরম্ভ করে আনুষঙ্গিক নানা জিনিষ কিনে দিতেন সুস্মিতাদি। ভালমন্দ খাবার পর্যন্ত তৈরি করতেন তিনি মেয়েটির জন্য। পিনাকীদার সহ্য হোতনা সেই আতিশয্য। মেয়েটিকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগত।

সেই মেয়েটিকেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি সুস্মিতাদি।

কিছ্‌ুদিন যাবার পর মেয়েটিকে এত বিশ্বাস করতে থাকেন যে তার সামনেই আলমারি খ্‌ুলে টাকা পয়সা কিংবা গহনাপত্র বার করতেন। তার মাশ্‌ুল দিতে হোল খ্‌ুব তাড়াতাড়িই।

মেয়েটি একদিন তার অন্‌ুপস্থিতির স্‌ুযোগে আলমারি খ্‌ুলে গয়নাপত্র সব নিয়ে চম্পট দেয়। মাসের শেষ বলে টাকা পয়সা বেশি ছিলনা। তাই টাকা পয়সা বেশি নিতে পারেনি। স্কুল থেকে বিকালবেলা বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা ভেজানো। অতঃপর মেয়েটির অন্‌ুপস্হিতি, খোলা আলমারি, গয়নাপত্র লোপাট ইত্যাদি দেখে দ্‌ুয়ে দ্‌ুয়ে চার করেছিলেন। তবে তার ধাতস্থ হোতে অনেকটাই সময় লেগেছিল। সেদিন থানাতেও খবর দিতে পারেননি।

পরদিন সকালেই পিনাকীদা এসে হাজির হয়েছিলেন দ্‌ুর্গাপ্‌ুরে। সব শ্‌ুনে থানায় খবর দেওয়া হয়নি জেনে খ্‌ুব রাগ করেছিলেন। মেয়েটি ধরা পড়েছিল পরের দিনই। কিন্তু গয়নাপত্র পাওয়া গেলনা তার কাছে। শোনা গেল ট্রেনে একজনের কাছে অল্প দামে সেগ্‌ুলি বিক্রি করে দিয়েছে সে।

পিনাকীদা চেয়েছিলেন মেয়েটির হাজতবাস হয়। স্‌ুস্মিতাদির তা ইচ্ছা ছিলনা। তিনি আশ্চর্য ক্ষমাশীলতা দেখিয়েছিলেন। তার উদ্যোগেই মেয়েটি ছাড়া পায়। পিনাকীদা এত রেগে গিয়েছিলেন যে স্‌ুস্মিতাদির সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্‌ুস্মিতাদি 'আমার গয়না গেছে। সে আমি ব্‌ুঝব। দোহাই তোমার। ত্‌ুমি আর তা নিয়ে মাথা খারাপ করোনা' বলে নিব্‌ৃত্ত করেছিলেন তাকে। স্‌ুস্মিতাদির যারা কট্টর নিন্দ্‌ুক তারাও সেই ক্ষমাশীলতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেনি।

ম্‌ৃদ্‌ুলার মনে হোল ভ্‌ুবনেশ্বরীর প্রতিও হয়ত সেই একই বাৎসল্য-বোধে তিনি তার প্রতি নিষ্ঠ্‌ুর হতে পারেননি। আশ্চর্য! এসব কথা আগে কোনদিন ভাবেনি সে। এত বছর পর স্ম্‌ৃতিচারণের স্‌ূত্রে ঘটনাগ্‌ুলি পাশাপাশি আসায় তাদের মধ্যে যোগস্‌ূত্রটি কিংবা বলা যেতে পারে তাদের অন্তর্নিহিত ম্‌ূলস্‌ূত্রটি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ম্‌ৃদ্‌ুলার খ্‌ুব অবাক লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন খ্‌ুব চেনা জায়গায় লক্ষণীয় কোন জিনিষ দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করেনি। তার দ্‌ৃষ্টির অগোচরে রয়ে গিয়েছিল সেটি। হঠাৎ সেটি চোখে পড়ায় মন বিস্ময়ে

ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আশ্চর্য এতদিন চোখে পড়েনি কেন? আর আজই বা চোখে পড়ল কিভাবে?

এত বছর পর মৃদুলার কাছে সব কেমন অন্য রকম ঠেকল। ভুবনেশ্বরীর প্রতি সুস্মিতাদির মমত্ববোধের যে জায়গাটি তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত এতদিন, তা হঠাৎ কোন আশ্চর্য স্মৃতিরসায়ণের প্রক্রিয়ায় আলোকিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সব কুজ্ঝটিকা মিলিয়ে গেল। দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল অনেক কিছু।

সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক কম্পন অনুভব করার মত দ্রুত একটি চিন্তা নাড়া দিয়ে গেল তাকে। পিনাকীদার প্রতি সুস্মিতাদির ভালবাসার মধ্যেও কি পরিব্যাপ্ত নেই সেই বাৎসল্যবোধ? আর সেই কারণেই কি পিনাকীদা অত পেয়েও নিজেকে বঞ্চিত মনে করে এসেছেন এতদিন?

ছয়

পরপর কয়েকদিন ধরে মৃদুলা চেষ্টা করল সুস্মিতাদির সঙ্গে যোগাযোগ করার। কিন্তু তার সব চেষ্টা নিষ্ফল হোল। অথচ শর্মিষ্ঠার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়ার পর ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিটা বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। তার কেবলি মনে হচ্ছিল সুস্মিতাদি আত্মহত্যার রাস্তা বেছে নেবেন। সে জানে যখন আত্মহননের ইচ্ছা জাগে তখন একটা সর্বগ্রাসী ঘোর আচ্ছন্ন করে থাকে মনকে।

সেই সময়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যায় মানুষ। আত্মীয় পরিজন বা খুব কাছের কোন মানুষ যদি তখন ক্রমাগত সঙ্গ দিয়ে তাকে অন্যরকম বোঝাতে পারে কিংবা কোন ভাবে জীবনের প্রতি আকর্ষণ ফিরিয়ে আনতে পারে তাহলে অনেক সময়েই মনের গতির মোড় ফিরিয়ে দেওয় যায়।

মৃদুলা আরও শুনেছে আত্মহত্যার ইচ্ছা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়না। ঘুরে ফিরে বারবার সেই ইচ্ছার তাগিদ বোধ করতে পারে মানুষ। কিন্তু একটানা অনেকদিন ধরে তার জের নাকি চলতে পারেনা। অতএব যে সময়ে ওরকম ইচ্ছার ঘোরে থাকে মানুষ তখন যদি কোনভাবে তাকে

নিবৃত্ত করা যায় তাহলে সেই সম্ভাবনা দূর করা যায়। কিন্তু সুস্মিতাদি যেন নিপাত্তা হয়ে গেলেন। মৃদুলা অনেক চেষ্টা করেও তার নাগাল পেলনা।

ছুটি শেষ হতে আর বেশীদিন বাকি নেই। দুর্গাপুরে ফিরে যাওয়ার আগে বাপের বাড়ি একবার ঘুরে আসার কথা তার। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয়না। কেবলি মনে হয় যদি সুস্মিতাদি আবার সেদিনের মত হঠাৎ এসে হাজির হন? তাহলে মৃদুলা তাকে বোঝাবে।

তার প্রথম বিয়ের দুর্ঘটনার পর যখন সে বিমর্ষ মনমরা হয়ে থাকত তখন সুস্মিতাদি তাকে একটি দামী কথা বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—'জীবন সম্ভাবনাময়। শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি আস্থা রাখতে হয়।'

সুস্মিতাদিকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে বলবে—'আপনি নিজে একদিন এই কথা বলেছিলেন। আজ তা ভুলে গেছেন? দেখেছেন তো আপনার কথা কিভাবে ফলে গেছে আমার জীবনে? জীবন শেষ পর্যন্ত সত্যিই বঞ্চিত করেনি আমায়।'

দীপঙ্কর অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে থাকে। একা একা অসহ্য লাগে তার। আগে এই সমস্যা ছিলনা। বই পড়ে ভাল ভাবেই কেটে যেত সময়। এখন মাঝেমাঝেই সুস্মিতাদির কথা মনে পড়ে। একাগ্রভাবে কোন কিছুতে মনোনিবেশ করা যায়না। সুস্মিতাদির জীবন একটা সরু সুতোর উপর ঝুলছে। যে কোন সময় সেই সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে।

একদিন বিভিন্ন সময়ে সুস্মিতাদির লেখা কতগুলি চিঠি নিয়ে বিছানার ওপর বসল মৃদুলা। সুস্মিতাদি চিঠি লিখতে ভালবাসেন। তাছাড়া চিঠি লেখায় মুন্সীয়ানাও আছে তার যথেষ্ট। প্রথম দিকে লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে যে পারিপাট্য ও সংস্কৃতির ছাপ আছে পরবর্তীকালে লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে তার অভাব পীড়াদায়কভাবে চোখে পড়ে। অন্তরের ক্রোধ আর জ্বালা চিঠিগুলোর ছত্রে ছত্রে প্রকট হয়ে পড়েছে। ভাষাও অনেক কঠিন, নগ্ন ও শাণিত। বক্তব্যও অনেক অমার্জিত।

একটি চিঠিতে চোখ পড়ে মৃদুলার। সুস্মিতাদি লিখেছেন—'আমার বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলছে। যে রাক্ষসী আমার সুখ শান্তি এভাবে গ্রাস করেছে আমি তাকে প্রতি মুহূর্তে অভিশাপ দিই।

ঈশ্বর আছেন। তিনি আমার কষ্ট দেখছেন। ওর কখনও ভাল হবেনা। ওর সংসারেও আগুন জ্বলবে। আমার মত ওকেও সব খুইয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে হবে একদিন।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মৃদুলা। বক্তব্য যত অমার্জিতই হোক মানুষটার ভাঙ্গা বুকের যন্ত্রণা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ল কতদিন তার সামনে, অনসূয়াদির সামনে, বুকভাঙ্গা আর্তনাদ করেছেন তিনি। দাঁত কিড়মিড় করে অভিশাপ দিয়েছেন ভুবনেশ্বরীকে নয়, তার মাকে। বাড়ি গাড়ি টাকার লোভে ভুবনেশ্বরীকে যে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করেছে।

সেই সময়ে স্বাভাবিক থাকতনা তার চোখমুখ। দুঃখে ক্রোধে অপমানে উন্মাদিনীর মত আচরণ করতেন তিনি। শেক্সপিয়েরের নাটকের ডাইনীদের মত ভয়ঙ্কর দেখাত তাকে। মাঝে মাঝে আবার বুক চাপড়াতে চাপড়াতে জোরে জোরে কাঁদতেন।

বলতেন—'আমার এই বুকটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে রে। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করেনা। কী হবে বেঁচে? আমার কেউ নেই। স্বামী নেই, পুত্র নেই, বাবা নেই, মা নেই, কেউ নেই।'

কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হোতনা। ক্ষণে ক্ষণে রূপবদল হোত। একটু পরেই অন্য মূর্তি ধারণ করে বলতেন—'বুঝলি, ঐ ডাইনী মাগী পিনাকীকে তুকতাক করেছে। ওকে নপুংসক করে রেখেছে। যাতে মেয়ের কোন ক্ষতি না হয়। কম ধাড়িবাজ ঐ বুড়ি? আটঘাট বেঁধে তবে ও কাজ করে।'

নিঃশব্দে মৃদুলা আর অনসূয়াদির মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হোত। অনসূয়াদির মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হোতনা মৃদুলার। সে বুঝত তার মত অনসূয়াদিও ভাবছেন এই মুহূর্তে এই উন্মাদিনীর মুখে অমার্জিত ভাষায় গালিগালাজ শুনে কে ভাবতে পারবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীটি সে অর্জন করেছে? পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মহিলার সঙ্গে কোন পার্থক্যই তখন দেখা যেতনা তার।

কিন্তু মনে যা-ই ভাবুক, মুখে সেকথা ব্যক্ত করার সাহস ছিলনা তাদের। আচারে আচরণে তখন পুরোপুরি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন সুস্মিতাদি। স্কুলে প্রায়ই আসছেননা। যদিও বা আসেন, তাহলেও

অনেক সময়েই ক্লাসের কথা কেউ মনে করিয়ে দিলে তার সঙ্গে তুমুল কলহে লিপ্ত হন।

সভ্যতা, ভব্যতা, শোভনতা—এক কথায় মানবসভ্যতা মানুষের আচার আচরণে যে শ্রী এনে দিয়েছে তার সব কিছু খুইয়েছিলেন তখন সুস্মিতাদি। সহকর্মীদের সঙ্গে বচসা লেগেই থাকত।

অনেক সময় এমন উচ্চগ্রামে চড়া পর্দায় ঝগড়া করতেন যে ছাত্রীদেরও কানে যেত তা। ছাত্রী মহলেও তা নিয়ে আলোচনা চলত। শিক্ষিকাদের কাছে অস্বস্তির কারণ হোত সেটি। কখনও অসহ্য হয়ে উঠলে অনসূয়াদি সাহস করে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেই উন্মাদিনীকে রোখে কার সাধ্য? পারিবারিক অশান্তির তীব্র বিষে জরজর সুস্মিতাদি তা উদ্গীরণ করতেন অন্যদের কাছে।

অনসূয়াদির সংসারেও সুস্মিতাদিকে কেন্দ্র করে অশান্তির আবহাওয়া ঘনিয়ে এসেছিল সেই সময়। সময় নেই অসময় নেই নিজের নিঃসঙ্গতার জ্বালা ভোলার জন্য অনসূয়াদির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন সুস্মিতাদি। অনসূয়াদির স্বামী বিরক্ত হতেন। সব কিছু সত্ত্বেও বন্ধুর জন্য অনসূয়াদির মনে একটা কোমল জায়গা ছিল। সুস্মিতাদির সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে পারতেননা তিনি।

. অনেক সময় এমন হোত যে সুস্মিতাদি উঠছেননা দেখে তাকে নিজের বাড়িতেই স্নানাদি করে খেয়ে যেতে বলতেন। সুস্মিতাদি রাজী হয়ে যেতেন। আসলে নিজের সংসার ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে বাড়িতে ফিরে আসার তাগিদ বোধ করতেননা। ভাঙ্গা সংসারের টুকরোগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া না করতে পারলে তার যেন স্বস্তি হোতনা।

ক্রমাগত এক প্রসঙ্গ কারুরই ভাল লাগতে পারেনা। অনসূয়াদির স্বামী বিরক্ত হতেন। বিশেষ করে যখন দেখতেন সুস্মিতাদি পরিবারের কর্তাকে এক রকম অগ্রাহ্য করেই অকথ্য অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করে পিনাকীদাকে কিংবা ভুবনেশ্বরীর মাকে গালিগালাজ করছেন। সবচেয়ে বড় কথা নিজেদের নিভৃত অবসরটুকু উপভোগেও বাধা পড়ত। যখন তখন হুটহাট করে চলে আসতেন।

এমনও হয়েছে রাত দশটা বেজে গেছে তবুও সুস্মিতাদি যাওয়ার নাম করছেননা। বাধ্য হয়ে তখন অনসূয়াদি রাতটা সেখানেই থেকে যেতে বলতেন। কিন্তু মুশকিল হোত শোওয়ার সময় বন্ধুকে পাশে

চাইতেন। অনসূয়াদির স্বামী বিরক্ত হতেন। অনসূয়াদির কাছে মৃদুলা শুনেছে যে রেগে গিয়ে মাঝেমাঝেই নাকি সক্ষোভ মন্তব্য করতেন স্ত্রীর কাছে।

—এ কি উৎপাত! আমাদের তো একটা সংসার আছে না কি? কতদিন এসব আবদার বরদাস্ত করা যায়?

স্বামী কন্যা নিয়ে অনসূয়াদির ছোট সংসার ঠিকই। তবু প্রত্যেক সংসারেই কতগুলি অবশ্য করণীয় কাজ থাকে। অনসূয়াদিও সর্বক্ষণ বন্ধুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারতেননা। গৃহকর্মে যখন তিনি ব্যস্ত থাকতেন তখন অনসূয়াদির স্বামী ব্রিজেশদাকে ভদ্রতা রক্ষার্থে টুকটাক কথা চালাতে হোত সুস্মিতাদির সঙ্গে। সুস্মিতাদির আবার 'কানু ছাড়া গীত নাই'। দিনের পর দিন এক প্রসঙ্গ, এক মন্তব্য, এক গালিগালাজ শুনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতেন ভদ্রলোক।

শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে পারিবারিক শান্তিরক্ষার্থ অনসূয়াদিকেই অনেক ভ্যানতাড়া করে বলতে হোল যে তার স্বামীর কতগুলি জরুরী কাজ আছে। তিনি নিরিবিলি বাড়িতে সেগুলি সারতে চান। অনসূয়াদিকে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে। স্বামীর জন্য কিছুদিন তাকে বন্ধু সংসর্গের লোভ ত্যাগ করতে হবে।

অনসূয়াদির কথার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা হয়নি সুস্মিতাদির। এমনিতে যত অস্বাভাবিকতাই দেখা দিক না কেন বন্ধুর কথার তাৎপর্য কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছিলেন সুস্মিতাদি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রায় আর্তস্বরে অপরাধীর মত ভঙ্গীতে নাকি বলেছিলেন —'সত্যিই তোদের খুব জ্বালাচ্ছি। তোদেরও তো ব্যক্তিগত জীবন আছে।'

অনসূয়াদি মৃদুলাকে বলেছিলেন তিনি নাকি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এত তাড়াতাড়ি সুবোধ বালিকার মত সব কিছু যে সুস্মিতাদি মেনে নেবেন তা নাকি তিনি ভাবতে পারেননি। তার খুব কষ্ট হয়েছিল সুস্মিতাদিকে দেখে। তবু স্বামীর অসুবিধার কথা ভেবে বন্ধুর সঙ্গে নির্দয় ব্যবহারে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই দু'জনের সম্পর্কও মৃদুলার কাছে বিচিত্র বলে মনে হয়। অনেকটাই বিপরীত স্বভাবের হলেও দু'জনের বন্ধুত্বে কোনদিন চিঁড় দেখেনি মৃদুলা। সুস্মিতাদির যত দোষই থাক অনসূয়াদি অপার

স্নেহে ও মমতায় তাকে বন্ধুত্ব দিয়েছেন, তাকে আগলে রেখেছেন। প্রয়োজনে সুপরামর্শ দিতেও কার্পণ্য করেননি কোনদিন।

সুস্মিতাদি প্রথম দিকে বিশ্বাস রাখতেন যে আবার সব কিছু বদলে যাবে। পিনাকীদার মোহঘোর কেটে গেলে আবার তিনি ফিরে আসবেন তার ছত্রছায়ায়। সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ধরনা দিতে পর্যন্ত শুরু করেছিলেন তখন। তাগাতাবিজ ধারণ করে নানারকম বিধিনিষেধ পালন করে স্বামীকে ফিরাবার চেষ্টা করেছেন। .

ব্যক্তি মর্যাদাবোধের ছিঁটেফোটাও তখন আর অবশিষ্ট ছিলনা তার মধ্যে। তাকে দেখে মনে হোত তার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে। হৃত সম্পদ ফিরে পাওয়ার জন্য সবরকম কষ্ট স্বীকারেই রাজী ছিলেন তিনি। কত রকমের অস্বাভাবিকতা যে তখন আশ্রয় করেছিল তাকে তার আর ইয়ত্তা নেই। শুচিবায়ুগ্রস্ততা দেখা গিয়েছিল। অনেক সময়েই উলঙ্গ অবস্থায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে তবে কোন তাগা বা তাবিজ ধারণ করতেন। শৌচাগারে যাবার সময় সেগুলি খুলে রাখতেন।

লোকমুখে শোনা এসব কথার সত্যতা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেছিল মৃদুলা। লজ্জাও কমে গিয়েছিল যেন। মৃদুলার সামনেই একবার বাথরুম থেকে একরকম বিবস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য মুহূর্তের জন্য। পাশের ঘরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরে নিয়েছিলেন।

পরে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিল। তাগাতাবিজ সাধু সন্ন্যাসী কিংবা ব্রত উপবাসেও যখন কোন ফল হলোনা তখন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করলেন সুস্মিতাদি। যখন তখন ভুবনেশ্বরীর বাড়িতে চিঠি পাঠাতে থাকলেন। ভুবনেশ্বরীর নামের আগে লিখতেন 'মিসেস ভুবনেশ্বরী রায়'। ভুবনেশ্বরীর পিতৃপদবী লিখতেন না।

সেই চিঠিতে পিনাকীদার সম্পর্কে হুশিয়ারি থাকত। পিনাকীদা কত ঘৃণ্য চরিত্রের তার নানা নিদর্শন তুলে ধরা হোত। বিশেষ করে তার অর্থলিপ্সা কত সাংঘাতিক তা জানিয়ে ভুবনেশ্বরীকে তার সম্পর্কে সাবধান হোতে বলতেন। তার প্রথম স্ত্রীকে (ইচ্ছা করেই তিনি ঐ শব্দ ব্যবহার করতেন প্রায় প্রতিটি চিঠিতে) কিভাবে তিনি বিয়ের আগে থেকে অর্থের জন্য ক্রমাগত দোহন করে এসেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা পাঠাতেন। আনুষঙ্গিক নানা দোষ, তার পরিবারের লোকজনেদের দোষত্রুটি বিশদভাবে জানিয়ে চিঠি দিতেন।

প্রায় প্রতিটি চিঠিই শেষ করতেন এই বলে যে সময় থাকতে সাবধান না হলে পরে সমূহ বিপদ। ভুবনেশ্বরীকে গানের সূত্রে অর্জিত অর্থের হিসাব রাখতে অনুরোধ করতেন। কোনক্রমেই ভুবনেশ্বরী যেন অর্থলোভী পিনাকীদার ফাঁদে পা দিয়ে নিজের সর্বনাশ না ডেকে আনে তার জন্য একরকম সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতেন প্রতিটি চিঠির শেষে। পিনাকীদাকে কিন্তু তখন একটি চিঠিও লিখতেননা।

ভুবনেশ্বরীর মাকেও মাঝে মাঝে চিঠি দিতেন। সে চিঠির ভাষা অনেক অন্যরকম হোত। গালিগালাজ করে অভিশাপ দিয়ে লেখা হোত সেই চিঠি। চিঠির বক্তব্য কি হবে তা নিয়ে আগে অনেক মক্স করতেন। মৃদুলাদের সঙ্গেও তা নিয়ে আলোচনা করতেন।

মৃদুলা বা অনসূয়াদি সুস্মিতাদিকে নিবৃত্ত করতে চাইতেন। বলতেন—এভাবে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলে লাভ কি তার? কিন্তু সুস্মিতাদি সেকথায় কান দিতেননা। প্রতিশোধস্পৃহায় তার চোখে জ্বলে উঠত আগুন। জোরে জোরে শ্বাস নিতেন।

—বলছিস কি তোরা? অত সহজে ঐ রাক্ষসীকে ছেড়ে দেব আমি? এখনও কেন মরিনি জানিস? ওর ষোলকলায় সর্বনাশ দেখে তবে আমার শান্তি। আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি ও দাপিয়ে দাপিয়ে আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে। ঐ দৃশ্য দেখার আগে আমার চোখে ঘুম নেই, আমার মনে শান্তি নেই। আমি তো এখন বেঁচেও মরে আছি। যার মান সম্মানই রইল না তার বাঁচা মরা দুইই সমান। আমার লাজ লজ্জা সব গেছে। আত্মহত্যাই এখন একমাত্র উপায়। কিন্তু ওর শাস্তি না দেখে মরেও শান্তি পাবনা আমি।

ভূতগ্রস্ত মানুষের মত হয়ে গিয়েছিলেন তখন সুস্মিতাদি। মাথায় একটিমাত্র চিন্তা কি করে ভুবনেশ্বরীদের শাস্তি দেবেন। কত রকমের পরিকল্পনা করতেন, কত রকমের চিঠির খসড়া তৈরি করতেন। লাইব্রেরিতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মৃদুলার চোখে পড়ত দূরে একান্তে বসে সুস্মিতাদি খসখস করে লিখে চলেছেন।

সুস্মিতাদির কষ্ট বুঝেও তার রাগ হোত। মনে হোত স্বামীকে যত ভালই বাসুন তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য কি এভাবে নিজেকে এত নীচে নামাতে হয়? এত বুদ্ধিমতী হয়েও সুস্মিতাদি নিজের সম্মান এভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছেন? মনে হোত, শয়তান ভর করেছে তার

ওপর। তাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিচ্ছে। সুস্মিতাদির আত্মাকে করায়ত্ত করতে চাইছে। কখনও কখনও আপন কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে মৃদুলাকে কিংবা অনসূয়াদিকে চিঠির খসড়া দেখাতেন। প্রতিশোধ স্পৃহায় তার চোখে ধক করে জ্বলে উঠত এক অতিলৌকিক দ্যুতি।

—পড়ে দ্যাখ। এ চিঠি পড়ে ওদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে কিনা বল ? আজই ডাকে দিতে হবে।

মৃদুলারা বিরক্ত হোত। অনেক করে বোঝাত যে সুস্মিতাদি যা করছেন তা এক ধরনের পাগলামি বা ছেলেমানুষি। এসবে কোন লাভ হবেনা। বরং পিনাকীদার সপক্ষেই জনমত তৈরি হবে।

সুস্মিতাদি দমতেননা।

—জনমতের কথা বলিসনা। জনমত আমি থোড়াই কেয়ার করি। পিনাকীকে যখন বিয়ে করব বলেছিলাম তখনও লোকে আমায় কম ছি ছি করেনি। কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনি। আর কেন গ্রাহ্য করব বলতে পারিস ? জনমতের ক্ষমতা কতটুকু ? যদি সত্যিই কোন ক্ষমতা থাকত তাহলে এমন ভ্রষ্টাচার চলতে পারত ?

সঙ্গে সঙ্গে আবার হাউ হাউ করে কাঁদতেন।

—বাবা দাদারা আমার জন্য কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এনেছিলেন। কিন্তু আমি তো ওকে ভুলিনি ? আমার সঙ্গেও তো কত জনের আলাপ পরিচয় হয়েছে। পিনাকীর তুলনায় তারা সর্বাংশে শ্রেয় ছিল। তাদের কেউ কেউ আমায় বিয়ে করতেও চেয়েছে ? কিন্তু আমি কি ওর সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করতে পেরেছি। অথচ ও কত সহজে সব ভুলে গেল। আমাকে এখন মায়ের বয়সী বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেও বাঁধেনা ওর।

একটু পরেই সুর পাল্টে যেত কথার। আত্মমগ্ন ভঙ্গীতে যে কথাটা বলতেন তা ইতিমধ্যে বহুবার বলেছেন তিনি মৃদুলাদের।

—তোরা তো জানিস প্রথম দর্শনেই আমার মনে হয়েছিল ও যেন আমার বহুকালের চেনা। যেন জন্ম জন্মান্তরের পরিচয় আমাদের। আসলে যা ঘটেছে তার সব দায়টা তো পিনাকীর নয়। আসল কালপ্রিট তো ভুবনেশ্বরীর মা।

ঘন ঘন কলকাতায় যেতেন তখন সুস্মিতাদি। ভুবনেশ্বরীরা ইতিমধ্যে পাকাপাকিভাবে কলকাতার বাসিন্দা। পিনাকীদা পরিবারের

সঙ্গে থাকতেননা। বালিগঞ্জে ভুবনেশ্বরীদের বাড়ির কাছাকাছি ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতেন। নিজের বাড়ীর লোকজনেদের সঙ্গেও তেমন সম্পর্ক রাখতেননা।

সুস্মিতাদির বাবা মারা যাওয়ার পর তার দাদা এসে সিঁথির বাড়িতে থাকছিলেন। কলকাতায় গেলে সেখানেই উঠতেন। শ্বশুরবাড়ি পাশেই। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তার বাড়ির লোকজনেদের খবরাখবর নিতেন। তাদের জন্য এটাসেটা নিয়ে যেতেন। তার নিজের মুখেই শুনেছে মৃদুলা যে তিনি আশা করেছিলেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পিনাকীকে ভুবনেশ্বরীদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার সে আশাও মিথ্যা হোল।

সুস্মিতাদি লক্ষ্য করলেন তার জন্য তাদের মনে বিন্দুমাত্রও টান নেই। বরং তাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে তার মনে হোল তারা যেন পিনাকীর সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ চাইছে। নামী গায়িকা তাদের পরিবারের বউ হলে তাদের সুনাম বই দুর্নাম হবেনা—তাদের ভাবখানা সেরকমই।

তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে অতঃপর সুস্মিতাদি শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও সব সম্পর্কের পাট চুকিয়ে দিলেন। পিনাকীর সূত্রেই শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক। সেকারণেই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা। তারা পিনাকীর ব্যাপারটা যেভাবে মেনে নিচ্ছে তারপরে আর তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখানোর মানে হয়না।

মনে মনে সুস্মিতাদি আরও যেন নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। বাপের বাড়ির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরেই তেমন সম্পর্ক নেই। কোন রকমে একটা সরু সুতোর ওপর ঝুলছে সেটি। যে কোন মুহূর্তে তা ছিন্ন হয়ে যেতে পরে। পিনাকীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রথমাবধি কেউ ভাল চোখে দেখেনি। সুস্মিতাদি যদি নরম স্বভাবেব হতেন তাহলে হয়ত পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু তিনি ভাঙবেন তো মচকাবেননা।

একমাত্র দাদা বৌদি ও তাদের মেয়ের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক বজায় আছে। বাবার মৃত্যুর পর দাদা সিঁথির বাড়িতে এসে উঠেছেন। সুস্মিতাদি কলকাতায় এলে সেখানেই ওঠেন। কারণ ঐ বাড়ির সঙ্গে তার বহু বছরের স্মৃতি বিজড়িত। তবে প্রাণের টান তার এদের কারুর সঙ্গেই নেই।

দিদি এখনও রংপুরে। তার দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। একজন আসামে, অপর জন কুচবিহারে থাকে। ছোড়দা লণ্ডনেই রয়ে গেছেন। সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। কয়েক বছর আগে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিবাহ করেছেন। এখনও পর্যন্ত তাদের কোন সন্তান হয়নি। কি দিদি কি ছোড়দা কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ নেই সুস্মিতাদির। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কথা তো বলাই বাহুল্য।

কলকাতায় এলেই তার কাজ পিনাকীদার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া। তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে ঘুরছেন এই ধরনের খবর নেওয়া কিংবা ভুবনেশ্বরীর বাড়িতে ফোন করে তাকে উত্যক্ত করা। ভুবনেশ্বরীর গলা পেলেই 'হ্যালো মিসেস রায় কেমন আছেন' বলা। প্রথম দিকে 'রং নাম্বার' বলে ফোন রেখে দিত ভুবনেশ্বরী পরের দিকে হয় কিছু না বলে কিংবা সক্রোধে কোন মন্তব্য করে ফোন ছেড়ে দিত সে।

ভুবনেশ্বরীর বাবা বা ভাই ফোন ধরলে ফোন ছেড়ে দেন সুস্মিতাদি। কিন্তু মা ধরলে আর রক্ষা নেই। প্রথম থেকেই গালাগাল দিতে সুরু করে দেন। তার নমুনা হোল 'চমৎকার মিসেস ঘটক। মেয়ের দৌলতে চালাচ্ছেন ভালই। কিন্তু এভাবে কি চিরদিন চলবে? অন্যের সংসার ভেঙ্গে দিলে নিজের সংসার যে অক্ষত থাকেনা তা জানেননা?'

ভুবনেশ্বরীর মাও প্রথম প্রথম নির্বাক থেকে শুনে যেতেন। হয়ত বা গালাগালির বহর পরিমাপ করার একটা কৌতূহল কাজ করত তার মুলে। পরের দিকে মেয়ের মত তিনিও সক্রোধে রেখে দিতেন ফোন।

সুস্মিতাদি সেখানেই ক্ষান্ত হননি। পিনাকীদা ও ভুবনেশ্বরীর পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তির ফোন নং সংগ্রহ করে তাদেরও ফোন করে পিনাকীদা ও ভবনেশ্বরীর সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করতেন। বলাবাহুল্য সত্যমিথ্যার রং মিশিয়ে পরিবেশন করা হোত সেই সব তথ্য। সুস্মিতাদি নিজের মুখে স্বীকার করেছিলেন সেকথা। তিনি বলেছিলেন—'ওদের শায়েস্তা করার জন্য ওসব অস্ত্র প্রয়োগের দরকার হয়েছিল।'

কিন্তু সুস্মিতাদির হিসাবে গরমিল হয়েছিল। তাতে পিনাকীদার মনোভাব আরও কঠোর হয়েছিল। এখন মৃদুলার মনে হয় দুঃখে কষ্টে সুস্মিতাদির মাথাটা অতখানি খারাপ না হলে হয়ত পিনাকীদা বিবাহ-বিচ্ছেদের মত চরম পথ বেছে নিতেননা।

শেষের দিকে পিনাকীদাকে ভীষণভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করেছিলেন সুস্মিতাদি। যত রকমভাবে মানসিক নির্যাতনের ব্যবস্থা করা সম্ভব তা উদ্ভাবন করে মজা পেতেন। ধর্ষকাম ও মর্ষকামের পন্থা অনুসরণ করে বিচিত্র আত্মপ্রীতি লাভ করতেন।

সুস্মিতাদির স্বভাবে ইতিমধ্যে আরও একটি উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। সুখী দম্পতিদের সুখশান্তি যেন সহ্য করতে পারতেননা। ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করার অভ্যাস তার বরাবরই ছিল। অনেকের সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণীই শেষ পর্যন্ত ফলেছে। মৃদুলা নিজেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সেই অভ্যাস পরে কেবলমাত্র অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণাতেই পর্যবসিত হোল।

সুখী দম্পতিকে দেখলেই কোন না কোন অশুভ ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী না করে স্বস্তি হোতনা তার। সহকর্মীদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনও কোন মতান্তরের আভাস পেলেও যেন খুশি হতেন।

মাঝেমাঝেই তখন তাকে সক্ষোভ মন্তব্য করতে শোনা যেত।

—এত লোক মরে, ও মরেনা কেন বলতে পারিস? ও মরলে বিধবা হবো। তবু আমি শান্তি পাব। এত টানাপোড়েন তো সহ্য করতে হবে না!

পিনাকীদার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর আবার তার অন্য রূপ দেখা গেল। সুস্মিতাদি যেন নতুন করে প্রেমে পড়লেন পিনাকীদার। যেখানে যখন পিনাকীদার থাকার সম্ভাবনা সেখানে ছলছুতো করে উপস্থিত হতেন। দূর থেকে হলেও পিনাকীদাকে একবার চোখের দেখা দেখে আসতেন। যতভাবে সম্ভব তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। পিনাকীদা বা ভুবনেশ্বরী তা জানতেও পারতনা। তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল।

তার আচরণ আবার অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেল। সবচেয়ে বড় কথা যে মানুষ আগে পিনাকীদা বা ভুবনেশ্বরীর সম্পর্কে এত সোচ্চার ছিল সে হঠাৎ যেন নীরব হয়ে গেল। সকলেই মনে করল এতদিনে বোধ হয় ঝড়ের দাপাদাপি বন্ধ হোল। শান্ত আবহাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। কিন্তু ঘটনার গতি হঠাৎ অন্য দিকে মোড় ঘুরল।

সাত

ভুবনেশ্বরীর নদীতে তখন জোয়ার। তরতর করে এগিয়ে চলেছে তার জীবনতরী। পয়লা নম্বর নেপথ্য গায়িকা হিসাবে ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সে। প্রায় প্রতিটি সিনেমায় তার গান থাকে। সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়ে সেই গান 'হিট' গানে পরিণত হয়। প্রতিটি জলসায় সে আমন্ত্রিত হয়। খবরের কাগজে বা কোন ম্যাগাজিনে সংগীতের আসরে তোলা তার ছবির সঙ্গে পিনাকী রায়কেও দেখা যায়।

একটি ম্যাগাজিনে ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'আপনার প্রতিষ্ঠার পেছনে বিশেষ কারুর অবদান আছে কি?' জবাবে ভুবনেশ্বরী তার মা, একাধিক গুরু ও পরিশেষে পিনাকী রায়ের নামোল্লেখ করে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরী খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার উঁচু ধাপে যতই আরোহণ করতে থাকে, পিনাকীদার ঔজ্জ্বল্য ততই কমতে থাকে। ভুবনেশ্বরীর প্রতিষ্ঠার প্রখর দীপ্তি ম্লান করে দিল পিনাকীদার প্রতিভা। নিজের কথা বিস্মৃত হয়ে এতদিন তিনি কেবল ভুবনেশ্বরীর কথাই চিন্তা করেছেন। তার নিজের সম্ভাবনার পথ নিজেই রুদ্ধ করে দিলেন। এখন তাদের পরিচিতি উল্টো পথ ধরল। লোকেরা তাকে আড়ালে ভুবনেশ্বরীর ল্যাম্বোট বলে উল্লেখ করতে থাকল।

একদিন ভুবনেশ্বরীকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গীত জগৎ ও চলচ্চিত্র জগতের কর্তাব্যক্তিদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এখন ভুবনেশ্বরী স্বনামধন্য হয়ে উঠেছে। তাকে নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। বাড়ি, গাড়ি, মান সম্মান, খ্যাতি প্রতিপত্তি, অর্থ সব তার হাতের মুঠোয় এসেছে। পিনাকীদার অভিভাবকত্বের নাগপাশ তার ভাল লাগবে কেন? অতএব পিনাকীদার সঙ্গে তার মনোমালিন্য সুরু হয়ে গেল। দু'একটি ম্যাগাজিনে তা নিয়ে অম্লমধুর চাটনী সরবরাহ করা হোল।

এই সময় ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হোল জনৈক সঙ্গীত শিল্পীর। শুধু সঙ্গীত শিল্পীই নয়, সুরকারও বটে। বেশ কয়েকটি সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কাজ করে নামও করেছে। ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে বাজারে সরস আলোচনা চলল।

সুস্মিতাদির কানেও সেই খবর পেঁছিল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া দেখে মৃদুলারা নতুন করে বিস্ময় বোধ করল। স্বভাববিরুদ্ধ শান্ত ভঙ্গীতে ছোট্ট একটি মন্তব্য করে প্রসঙ্গের উপসংহার টানলেন তিনি—'ভুবনেশ্বরীর বয়স অল্প। পিনাকী ওর বাপের বয়সী। ওরকম অসম বন্ধুত্ব কি বেশিদিন থাকে? এ একরকম ভালই হয়েছে। তাছাড়া পিনাকী বড় স্বার্থপর আত্মপরায়ণ। ভুবনেশ্বরী ওর কাছে অনেক কিছুই পেতনা। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।'

মৃদুলারা লক্ষ্য করেছিল ইদানীং সুস্মিতাদি কলকাতায় গিয়ে আগের চেয়ে বেশিদিন করে থাকছেন। হঠাৎ যেন অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর অনেক নিরুচ্চার। এমনকি সঙ্গীত শিল্পী ও পরিচালক বিশ্বজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে ভুবনেশ্বরীর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যখন স্টাফরুমে আলোচনা চলত তখনও তিনি মুখ খুলতেননা।

নামোচ্চারণ না হলেও পিনাকীর প্রসঙ্গ উহ্য থাকত। ঠারে ঠোরে তাকে শুনিয়ে অনেক কিছু বলা হোত। আশ্চর্য! সব কিছু হজম করে যেতেন নিঃশব্দে। মৃদুলারা অবাক বিস্ময়ে সুস্মিতাদির পরিবর্তন লক্ষ্য করে যেত।

পরপর কয়েকটি সিনেমায় বিশ্বজিৎ চৌধুরীর সুরারোপিত গানে কণ্ঠ দান করল ভুবনেশ্বরী। দারুণ হিট হোল সেই সব গান। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল সেগুলি।

আর ভুবনেশ্বরীর উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সুরু হোল পিনাকীদার উত্তরোত্তর অবনতির পালা। মদ্যপানের অভ্যাস বরাবরই ছিল। তার মাত্রা বাড়তে থাকল। দিন রাত্রি সব সময়ে চুর হয়ে থাকেন। কাজেকর্মে উৎসাহ নেই, সব কিছুতেই শৈথিল্য। তার মধ্যে একদিন একটা গানের শট নেওয়ার সময় মাতাল অবস্থায় উপস্থিত হয়ে ভুবনেশ্বরী ও বিশ্বজিৎকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা অনেক কষ্টে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে তবে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

অনুরূপ ঘটনা কিন্তু ঘটতেই থাকে। একদিন ওরকম অবস্থায় পিনাকীদাকে প্রচণ্ডরকম মারধর করা হোল। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হোল। তার কর্মকর্তা কে বা কারা তা জানা গেলনা।

কিন্তু খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হোল সেই খবর। অনেক কিছুরই ইঙ্গিত ছিল সেই সংবাদের মধ্যে।

অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের জন্য মৃদুলা তখন ছুটি নিয়ে কলকাতায়। তার চোখেও পড়ল সেই খবর। সুস্মিতাদি তারও আগে ছুটি নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ছুটির মাত্রা বাড়ছিল বলে ইদানীং অনেক সময়েই মাইনা কাটা যাচ্ছিল তার। কারুর কোন হিতোপদেশেই কান দিচ্ছিলেননা। স্বয়ং প্রিন্সিপাল সাহেবাও তাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হননি। যেদিন খবরের কাগজে পিনাকীদার প্রহৃত হওয়ার খবর বেরুল সেদিনও তার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন সুস্মিতাদি।

মৃদুলা খবরটা দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেই ফেটে পড়েছিলেন রাগে।

—ওরা কি মানুষ? মানুষটা এখন একরকম আধমরা বৈ তো নয়! তাকে ওভাবে না মারলেই চলছিলনা? কাজের বেলায় কাজী আর কাজ ফুরোলে পাজী?

অপ্রয়োজন বোধে মৃদুলা কোন মন্তব্য করেনি। সুস্মিতাদি সেদিনও অনেকক্ষণ বসেছিলেন। সারাক্ষণ অতীতের স্মৃতিচারণা করেছিলেন। তখন তাতে দাহ ছিলনা, বিষোদ্গার ছিলনা। নিজের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার ব্যক্তিগত অনুভূতি দূরে সরিয়ে রেখে নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে পিনাকীদার অপরিণত বুদ্ধি, তার বুদ্ধিভ্রংশের জন্য আফশোস করেছিলেন।

প্রতিশোধের আগুন নিভে গিয়েছিল। পিনাকীদার কষ্ট সুস্মিতাদির মনের সব উগ্রতা ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। তার খরদৃষ্টি তখন ভুবনেশ্বরীর পরিবারের উপর নিবদ্ধ ছিলনা। পিনাকীদা যে চড়া দামে হলেও রাহুমুক্ত হতে পেরেছেন সেটাই যেন তার স্বস্তির কারণ হয়েছিল।

সুস্মিতাদি সেদিন কিন্তু পিনাকীদাকে নিয়ে নতুন করে সংসার গড়ার স্বপ্নের কথা মৃদুলার কাছে ভাঙ্গেননি। তবে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনাটাকে মৃদুলারা অনেক বড় করে দেখেছিল। আইনের নির্দেশকে তারা সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছিল। তার পরেও যে সম্পর্কের রেশ থেকে যায় সেকথাটা ভেবে দেখেনি তারা। তাই হয়ত সুস্মিতাদির মনের তল পায়নি কেউই।

অতঃপর যথাসময়ে ধুমধামের সঙ্গে ভুবনেশ্বরী ঘটক ও বিশ্বজিৎ

চৌধুরীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হোল। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হলেন সেই অনুষ্ঠানে। বলাবাহুল্য পিনাকীদা বাদ গেলেন। ভুবনেশ্বরী ও বিশ্বজিতের হাস্যোৎফুল্ল ছবি ছাপা হোল কাগজে, দু'একটি ম্যাগাজিনে। মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য হাওয়াই জাহাজে পাড়ি দিল তারা লণ্ডন অভিমুখে।

পিনাকীদা কিছুতেই সেই ব্যাপার মেনে নিতে পারলেননা। দুঃখের উপশম খুঁজতে রাত্রিদিন আরও বেশি মাত্রায় মদ্যপান করতে থাকেন। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটল। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। বাড়ির লোকেরা সিঁথিতে নিয়ে আসল তাকে দেখাশোনার জন্য।

বাড়িতে অবাধে মদ্যপান চলেনা। অতএব একটু সুস্থ হয়ে উঠেই আবার বালিগঞ্জে নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন পিনাকীদা। আবার শুরু হোল আগের মত মদ্যপান। শেষে মত্ত অবস্থায় মোটর গাড়ির তলায় চাপা পড়ে নিজের জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটালেন তিনি।

কিন্তু সুস্মিতাদি কেন নিজেকে দায়ী করছেন তার জন্য? যা ঘটেছে তার সব দায় তো তার নয়? তাছাড়া বহু দিন পূর্বেই দুজনের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। আইনতঃ তাদের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই আর। মানসিক দিক দিয়েও কোন কারণেই খুব টান বোধ করার কথা নয় সুস্মিতাদির। তবু কেন এভাবে এত কষ্ট পাচ্ছেন?

অঙ্কের হিসাবে জীবনকে সত্যিই বোঝা যায়না। তবে সুস্মিতাদিকে এভাবে সে কষ্ট পেতে দেবেনা। দুঃখের সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আজীবন ঋণী থাকবে সে তার কাছে। কাল সে নিজে গিয়ে উপস্থিত হবে সুস্মিতাদির বাড়ি। দীপঙ্কর যাই বলুক তাকে বুঝিয়ে নিয়ে আসবে সে নিজের কাছে।

ছুটি ফুরোতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। সুস্মিতাদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সে দুর্গাপুর। সেখানে নিজের কাছে রেখে দেবে। ভালবাসা দিয়ে তার মনের শূন্যতা দূর করতে হবে। সাহচর্য দিয়ে নিঃসঙ্গতার ফাঁক ভরিয়ে তুলতে হবে।

পরদিন দীপঙ্কর অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর তৈরি হয়ে নিল মৃদুলা। শোবার ঘরের দরজায় তালা দিয়ে বাইরের ঘরে আসতেই কলিংবেল বেজে উঠল। মৃদুলার মনে হোল সুস্মিতাদি নয়ত? কিন্তু কি-হোলে চোখ দিয়ে ও সুস্মিতাদিকে নয়—শর্মিষ্ঠাকে দেখতে পায়।

ওর বাড়ি নাগেরবাজারে। মাঝেমধ্যে মৃদুলার কাছে আসে ও। তবু মৃদুলার মন বলল আজও অবশ্যই কোন খবর নিয়ে এসেছে। এবং সেই খবর নিশ্চয়ই খুব সাংঘাতিক। শর্মিষ্ঠাকে দরজা খুলে দিয়ে সপ্রশ্ন চোখে তাকায় সে।

মৃদুলার চোখের ভাষা বুঝতে দেরি হয়না শর্মিষ্ঠার। তবু সে সঙ্গে সঙ্গে ধরা দেয়না।

—এক গ্লাস জল খাওয়াও তো। যা গরম!

মৃদুলার বুকে ধুকপুকুনি একভাবে চলতে থাকে। কোন রকমে ভয়ঙ্কর সেই অস্থিরতা চাপা দিয়ে ও দরজা বন্ধ করে। ফিল্টার থেকে জল গড়িয়ে ওর কৌতূহল ব্যক্ত করে।

—তুমি হঠাৎ? আমি এখনি বেরোচ্ছিলাম। সুস্মিতাদির বাড়ি। মনটা খুব উচাটন হয়ে রয়েছে। তাই ভাবছিলাম নিজেই গিয়ে ওঁর খবরটা নেব।

এক ঢোকে জলটা শেষ করে মৃদুলার দিকে এক পলক তাকায় শর্মিষ্ঠা। পরে অন্য দিকে দৃষ্টিটা সরিয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করে সেই ভয়ঙ্কর সংবাদটা।

—সুস্মিতাদি আত্মহত্যা করেছেন মৃদুলা। পরশু রাত্রে। একটা চিরকুটে লিখে গেছেন—'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

মৃদুলা চুপ করে শোনে। একটু থেমে আবার ধীরে ধীরে বলতে সুরু করে শর্মিষ্ঠা।

—আমি কাল দুপুরে গিয়েছিলাম ওঁর বাড়ি। তখনই জানতে পারলাম। কাল অনেকবার চেষ্টা করেছি টেলিফোনে তোমাকে খবরটা জানাবার। কিন্তু লাইন পাইনি। খবরটা শোনার পর থেকে মনটা এত ভারী হয়ে আছে যে কি বলব? তোমার কাছে এলাম মনটা হাল্কা করতে।

মৃদুলা বলল—'শান্তি পেলেন এতদিনে। সারা জীবন বড় কষ্ট পেয়েছেন। নিজেও জ্বলেছেন অন্যদেরও জ্বালিয়েছেন। এখন সব শেষ।'

শর্মিষ্ঠার মত মৃদুলা নিজেও অবাক হয়ে গেল নিজের কথা শুনে। কিন্তু শর্মিষ্ঠার কথার পিঠে কথাগুলি হঠাৎই যেন বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। তার অজান্তেই।

শর্মিষ্ঠা বলল—'আমি এমনটা যে হবে তা বুঝেছিলাম। তবু মনে হয় হয়ত কিছুটা সময় পার হলে এমনটা ঘটতনা। সত্যি যে স্বামী সারা জীবন কষ্ট দিল তার অভাবে জীবন যে এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে তা কি ভাবা যায়?'

মৃদুলা বলল—'সুস্মিতাদি আমার কাছে যেদিন এসেছিলেন সেদিন সারাক্ষণই খালি আফশোস করে গেছেন। অনুতাপে ভুগছিলেন উনি। আমার মনে হয় পিনাকীদার কাছে যদি অনুতাপ প্রকাশ করতেন তাহলে হয়ত কিছুটা শান্তি পেতেন মনে।'

শর্মিষ্ঠা বলল—'তুমি তো সবটা জাননা। আমি ওর বৌদির কাছে, ভাইঝির কাছে অনেক কিছু শুনেছি। ভুবনেশ্বরীর বিয়ের পর সুস্মিতাদি বেশ কয়েকবারই পিনাকীদার সঙ্গে দেখা করেছেন। উনি নাকি বলেছিলেন যা হবার হয়েছে। এখন আবার ওরা দুজনে নতুন করে সুরু করবেন জীবন। বলেছেন উনি পিনাকীদাকে অনেক জ্বালিয়েছেন, পিনাকীদা যেন ক্ষমা করেন। কথা দিচ্ছেন, আর কোন কষ্ট পেতে দেবেননা পিনাকীদাকে। কিন্তু পিনাকীদা রাজী হননি। বলেছেন যে সম্পর্ক চুকে গেছে তা আর জোড়া দেওয়া যায়না। তাছাড়া তিনি আর সে ব্যাপারে আগ্রহী নন।

মৃদুলার বিস্ময় থই পাচ্ছিলনা।

—আশ্চর্য তো! কিন্তু বৌদি বা ভাইঝি এত সব খবর জানল কি করে? সুস্মিতাদি কি ওদের কাছে এসব গল্প করেছেন?

—না তা নয়। ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়েই কয়েকবার দেখা করেছেন। বৌদি আপত্তি করেছিলেন। উনি শোনেননি। ভাইঝিকে সঙ্গ নিতেননা। কিন্তু পাছে পিনাকীদা ওঁকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সেই ভয়েই ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। নিজেই স্বীকার করেছেন সেকথা।

শর্মিষ্ঠা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল মৃদুলা একভাবে। মনে মনে সুস্মিতাদির উদ্দেশ্যে বারবার একই কথা বলতে থাকে সে।

'আপনার তুলনা নেই সুস্মিতাদি। আর কেউ হলে এতটা পারতনা।'

সে আরও বলে—'আমি জানিনা সুস্মিতাদি জন্মান্তর আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে প্রার্থনা করি আপনি যেন পরজন্মে সুখী হন। এ জন্মের কষ্ট আর যেন পরজন্মে বয়ে নিয়ে যেতে হয়না আপনাকে।'